কিশোর বিস্ময়

জুন ৮৪

বিস্ময়কর আবিষ্কার

অশোক রায়

মার্কিন বিজ্ঞানী, স্বনামধন্য চার্লস গুডইয়ার রাবার আবিষ্কারের জন্য অনেক দিন, অনেক বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বারবারই ব্যর্থ হচ্ছিলেন। তিনি এমন একটি বস্তু আবিষ্কার করে ফেললেন সেটি রাবার হলেও গুনগত বৈশিষ্ট্যে খুব নিম্নমানের। যেমন সেটি গ্রীষ্মকালে নরম ও চটচটে হয়ে যাচ্ছিল। এবং শীতের দিনে ভঙ্গুর ও শক্ত হয়ে যাচ্ছে। ১৮৩৯ সালের একটি দিনে রাবারকে সালফারের সঙ্গে মিশ্রিত করে সবেমাত্র নেভানো ষ্টোভের উপর রেখে তিনি বিশ্রাম করতে যান। বিশ্রামান্তে তিনি এসে দেখেন পাত্রের মিশ্রণটি পিন্ডের আকার ধারণ করেছে। মনে খুব আঘাত পেলেন, তিনি বুঝি ব্যর্থ হয়েছেন। বুঝতেই পারেন নি, সদা নেভানো ষ্টোভের তাপ লেগে ঐ মিশ্রণটি পিন্ডে পরিণত হবে। অগত্যা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে পিন্ডটি মাটিতে আছড়ে ফেলে দিলেন। অবাক কান্ড! পিন্ডটি লাফিয়ে উপরে উঠে এল। হুরে রে, বলে তিনিও লাফিয়ে উঠলেন। আবিষ্কৃত হল আধুনিক রাবার, গুনগত বৈশিষ্টে উন্নত। ষ্টোভের তল থেকে উদ্ভূত অতিরিক্ত তাপেই ব্যাপারটা ঘটে গেছে। এই রাবার শুকনো অথচ নমনীয়।

১৮১৯ সাল, ডেনমার্কের বিখ্যাত পদার্থবিদ এইচ সি ওয়েরষ্টেড মহাবিদ্যালয়ের ক্লাসে পদার্থ বিজ্ঞান পড়াচ্ছিলেন এবং পরীক্ষা করে ছাত্রদের দেখাচ্ছিলেন। তিনি একটি তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ তরঙ্গ কেমন করে প্রবাহিত হয় তার পরীক্ষা করে বোঝাচ্ছিলেন। পাশেই কিছুদূরে একটা কম্পাস ছিল। তার কাঁটাটা হঠাৎ নড়ে চড়ে উঠল। ওয়েরষ্টেড ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ ঝলকের মত তার মস্তিষ্কে একটা অসাধারণ ব্যাপার আবিষ্কার হয়ে গেল। তোমরা ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছ সেই আবিষ্কারটি কি? হ্যাঁ, এই ভাবে তিনি আবিষ্কার করলেন তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ।

কিশোর বিস্ময়

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা   জুন ঃ ১৯৮৪

□ সম্পাদক □
অনীশ দেব

□ নির্বাহী সম্পাদক □
অশোক রায়

□ নামাঙ্কণ □
বিমল দাস

□ অলঙ্করণ □
সুশান্ত বিশ্বাস
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস
শ্রীবিদ্যা অশোক

□ সার্কুলেশন □
নীহার রায়

□ সম্পাদকীয় কার্যালয় □
১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

অশোক কুমার রায় কর্তৃক কিশোর বিস্ময়ের পক্ষে ১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎ-কর্তৃক অনুরাধা প্রেস, ১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

ধারাবাহিক উপন্যাস

৪৩ সময় পর্যটক টারজান □ অদ্রীশ বর্ধন

বিজ্ঞান সুবাসিত গল্প

৫১ চোখ □ আনন্দ বাগচী
১৭ মাতন বাঁশি □ চন্দ্রভানু ভরদ্বাজ

ফ্যানটাসি গল্প

৭ বিস্ময়কর □ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞান ছড়া

৫ বিজ্ঞানী □ মৃণালকান্তি দাশ

আজও রহস্য

১৫ ইউ এফ ও □ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

ছবিতে কাহিনী ও সচিত্র বিস্ময়

১২ আইনষ্টাইন
৪৮ ভয়ংকর যাত্রা
১১ বিস্ময়ের নোট বই
১৩ বিশ্বের বিস্ময়
৪৭ খুঁজে বার করো
৫০ আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

বিশেষ ক্রোড়পত্র ঃ সমুদ্রের প্রাণ

২৪ গভীর সাগরের খুনী □ নিরঞ্জন সিংহ
২৬ সমুদ্রের বিভীষিকা অক্টোপাস □ জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০ জলের তলায় জীবন □ শিবনাথ রায়
৩৮ ক্রোড়পত্র কুইজ □ শিবনাথ রায়

জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা

৪১ চ্যাথাম দ্বীপের সরীসৃপ □ প্রবাল মুখোপাধ্যায়
২ দুর্ঘটনায় বিস্ময়কর আবিষ্কার □ অশোক রায়

বিজ্ঞানের ভেল্কি

৫৯ ডিম ও জাড্য □ মার্টিন গার্ডনার অবলম্বনে অশোক রায়

নিয়মিত বিভাগ

৬ ধাঁধা □ গরু ঘটিত সমস্যা □ অজয় ঘোষ
৪ বিজ্ঞান সংবাদ □ সব্যসাচী সেনশর্মা

সব্যসাচী সেনশর্মা

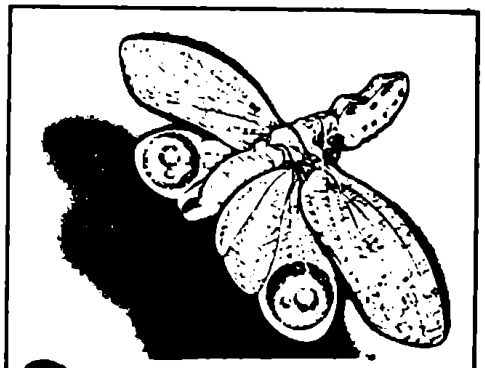

বিজ্ঞান সংবাদ

চশমায় টেলিস্কোপ :

কিছু কিছু মানুষের দৃষ্টি শক্তি প্রখর নয়। অনেকে কাছের বা দূরের জিনিস ভালো দেখতে পায়না। এবং এদের চশমাও ভালো কাজ দেয়না। কিন্তু এখন এদের জন্য একটি সুখবর আছে। এরা এদের চশমায় মিনি টেলিস্কোপ বসিয়ে নিতে পারে। এই টেলিস্কোপকে বলা হয় বাই-অপটিক। দূরকমভাবে এই টেলিস্কোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন বস্তু বা জিনিসকে বড় দেখবার প্রয়োজন হলে চশমার মধ্য দিয়ে তাকালেই বস্তুটি বড় আকার ধারন করবে। আবার বেশী দূরের জিনিস দেখবার ইচ্ছে হলে টেলিস্কোপটি ব্যবহার করতে হবে। চশমার মধ্যেই ১৪টি আঁতস কাঁচ লাগানো রয়েছে। টেক্সাসের হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্ষু বিশারদরা জানিয়েছেন এই বাই-অপটিক লেন্স তারাই ব্যবহার করতে পারবে যাদের পেরিফেরাল ভিসন ভালো অথচ পরিষ্কার দেখতে অসুবিধা হয়।

মশা মহাশয় :

তোমরা শুনলে অবাক হবে। ৩০০০ জাতের মশা এই পৃথিবীতে দেখা যায়। ম্যালেরিয়া ছড়ায় যে মশা সেই জাতের নাম হল অ্যানোফিলিস। এরা কিন্তু অপরিষ্কার জলে নয়, পরিষ্কার জলে ডিম পাড়তে ভালবাসে। মশা মাত্র তিন সপ্তাহ বাঁচে। এবং মাত্র ৫ কি, মি, পথ অতিক্রম করতে পারে। এরা মানুষের শরীরের মিষ্টি গন্ধে আকৃষ্ট হয়। সব চাইতে ভয় পায় এবং ঘেন্না করে ধোঁয়াকে। ম্যানসোনিয়া মশার কামড়েই ফাইলেরিয়া হয়। আরো জেনে রাখো, মশা ডেঙ্গুও সংক্রামিত করে। এটা নিশ্চয়ই জানো 'ম্যালেরিয়া ছড়ায় মশা' এই তথ্যটি আবিষ্কৃত হয় আমাদের ভারত থেকেই। সুতরাং এই মশা মহাশয়দের থেকে সাবধান !

কিশোর বিস্ময়

গ্রাহক হতে হলে :

- এক বছরের জন্য গ্রাহক হলে ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- পাঁচ বছরের জন্য গ্রাহক হলে ১২০ টাকা লাগবে। তার মানে চার বছরের গ্রাহক চাঁদা দিলে এক বছর বিনামূল্যে পত্রিকা পাবে।
- পত্রিকা সাধারণ ডাকে পাঠানো হবে অথবা সরাসরি কার্য্যালয় থেকে নিতে পারো।
- রেজিস্ট্রি ডাকে পত্রিকা নিতে হলে গ্রাহক চাঁদার সঙ্গে আরো ৩৬ টাকা অর্থাৎ মোট ৬৬ টাকা পাঠাতে হবে।
- এম, ও তে বা সরাসরি কার্য্যালয়ে এসে টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হওয়া যায়।
- শুধু গ্রাহকদের পূজো সংখ্যা অর্ধমূল্যে দেওয়া হবে।

কার্য্যালয়ের ঠিকানা :
কিশোর বিস্ময়
১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

বিজ্ঞানী

মৃণালকান্তি দাশ

'শুনেছ কি বিজ্ঞানী হরিরাম ভড়—
কল খুলে রুখে দেন রকমারি ঝড়?
টর্পেডো, টাইফুন, হারিকেন আর
কালবৈশাখী থামে ইঙ্গিতে তাঁর!
দম দিয়ে যেই তিনি খুলে দেন কল,
ভর গ্রীষ্মেও পড়ে মেঘ থেকে জল!
কল খুললেই সব পেয়ে যায় টের,
জারিজুরি নেই আর ভূমিকম্পের!
মাতলা, কংসাবতী আর দামোদর
বন্যায় ভাসাবে কী! ভয়ে থরথর!'

'কোন দেশী বিজ্ঞানী, কোথা তাঁর ডেরা?
খবরটা পেয়েছেন সাংবাদিকেরা?
বেরোয়নি কাগজে কি সাক্ষাৎকার,
বিজ্ঞানে এতবড় হাতযশ যাঁর?
বয়সই হয়েছে শুধু, শিখিসনি কিছু,
ঘোর সেই বিজ্ঞানীটির পিছু পিছু।
পারেন বানিয়ে দিতে তিনি সেই কল,
যে-কল খুললে পাবি হাতেনাতে ফল।
অঙ্ক, ভূগোলে তোর থাকবে না ভয়—
ধর তাঁর হাতে-পায়ে, এই তো সময়!'

ছবি □ শ্রীবিদ্যা অশোক

গত সংখ্যার শব্দ ছকের উত্তর

পাশাপাশি উত্তরঃ ১। বিদ্যুৎ ২। চুম্বক ৫। নভ ৬। টিন ৭। আদিমকাল, ৮। সীল ৯। জল ১১। কর্ভাস ১২। দ্রবণ।

উপর নীচে উত্তরঃ ১। বিমান, ৩। কঠিন ৪। মাদামকুরী ৬। জটিল ৮। সীসক ১০। লবণ।

গত সংখ্যার আবিষ্কার ও আবিষ্কারকের উত্তরঃ পেণ্ডুলাম ঘড়ি আবিষ্কার করেন ক্রিস্টিয়ান হাইগেনজ ১৬৫৭ সালে।

অজয় ঘোষ

☐ ধাঁধা ☐☐☐☐

একটি গরুঘটিত সমস্যা

পাড়ার দুধওয়ালাটা সেদিন রাস্তার মোড়ে পাকড়াও করল।

'আর পারি না খোকাবাবু, এর একটা ব্যবস্থা কর।'

'কি ব্যাপার?'

'আজ্ঞে আমার গরুটা খুব বুঝতে শিখেছে। একদম মানুষ হয়ে গেছে। মানুষকে গরু বলে গালাগাল দেয় শুনেছি। তাই বলে গরুকে মানুষ।'

'তা কি হয়েছে বলবে তো?'

'ওটাকে বেঁধে রেখে, ঘাস কেটে দিলে খাবে না।'

'ঘাসওলা মাঠে ছেড়ে দাও। তোমার কাজ কমবে।'

'তাহলেও বিপদ, রাক্ষুসে ক্ষিদে, পুরো মাঠটাই সাবাড় করে দেবে। তুমি একবার আমার মাঠে চল। ব্যাপারটা না দেখলে হবে না।'

ওর অনেকগুলো ছোটো ছোটো তিনকোনা মাঠ; প্রত্যেকটাই একেবারে সমবাহু ত্রিভুজ। আমি বললুম, 'তাহলে তুমি একদিন এক একটা মাঠে বেঁধে দাও। যাতে একটা মাঠের সব ঘাস খেতে পারে। তাহলেই হল।'

'না, না অত ঘাস একদিনে খেলে খারাপ হবে। আমি ঠিক একটা মাঠের আর্ধেক ঘাস ওকে খাওয়াতে চাই।'

'তাহলে মাঝখান দিয়ে একটা বেড়া দাও।'

'অত পয়সা নেই।'

'ও' বলে মাঠের মাঝখানে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলাম—কি করা যায়। খানিকক্ষণ পর ওকে গরুর দড়ির একটা মাপ বলে দিলাম। বললাম, 'প্রথম দিন এই টুকু দড়ি দিয়ে গরুটাকে এক কোনে বেঁধে দিও। পরের দিন দড়ি বড় করে দিও যাতে বাকী ঘাসটা পুরো খেতে পারে।' বলে চলে এলাম।

কয়েকদিন বাদে এক শিশি ঘি নিয়ে, ও এসে হাজির। 'খোকাবাবু তোমার জন্যে আনলাম, খুব ভাল ব্যবস্থা করেছ তুমি।'

ত্রিভুজটার একটা বাহু যদি চল্লিশ ফুট করে থাকে তাহলে দড়ির দৈর্ঘ্য কত ছিল? উত্তর আগামী সংখ্যায়।

গত সংখ্যার উত্তর: অসীম বাবুর জোড়া ধাঁধা

তোমরা অনেকেই নিশ্চয়ই অসীমবাবুর ধাঁধাগুলোর উত্তর বার করে ফেলেছো। তবু যারা পারোনি, তাদের

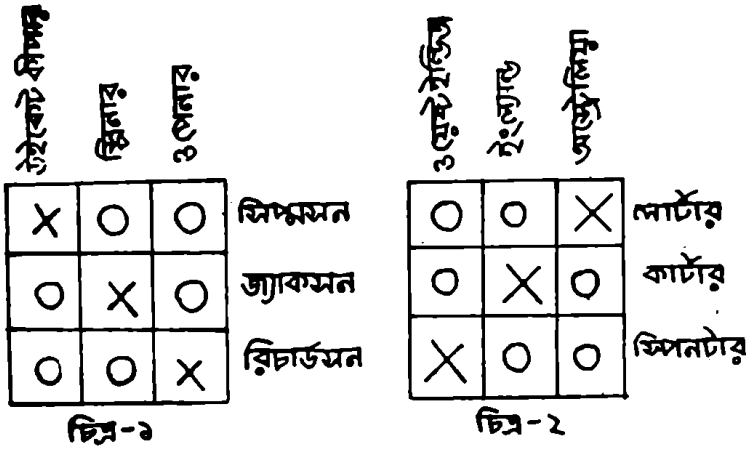

চিত্র-১ চিত্র-২

জন্যে বলি, এই ধরণের ধাঁধার উত্তর খুব সোজা হবে যদি ছকের সাহায্য নাও। চিত্র—১ এবং ২ য়ে ছক দুটো দেখান হল, কোনো সূত্র থেকে যদি কোন সঠিক মন্তব্য করা যায় তাহলে সেই খোপে '×' বসবে না হলে 'o'।

এখন দ্বিতীয় সূত্র থেকে দেখা যাচ্ছে ২নং চিত্রে বাঁদিকের তলার খোপে '×' হবে। স্বাভাবিক ভাবে তলার সারির বাকি দুটো খোপে 'o' হবে। তৃতীয় সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে স্পিনার অষ্ট্রেলিয়ার লোক। কার্টার এবং জ্যাকসন যখন অ্যাসেজ খেলেছে, তখন একজন ইংল্যান্ডের অপরজন অষ্ট্রেলিয়ার, আবার বা হাতি অল-রাউণ্ডার ও স্পিনার একই দেশের। সুতরাং বাঁ হাতি অলরাউণ্ডার অস্ট্রেলিয়ার লোক। তিনি কার্টার বা স্পিনটার নন। সুতরাং লার্টার নিশ্চয়ই অষ্ট্রেলিয়ার লোক। যেহেতু প্রত্যেক দেশের দুজন করে আছে, সুতরাং কার্টার ইংল্যান্ডের লোক। অর্থাৎ ২নং চিত্রে কোনাকুনি সব খোপগুলো '×' হবে। কার্টার ইংল্যান্ডের হলে জ্যাকসন নিশ্চয়ই অষ্ট্রেলিয়ার অর্থাৎ তিনি স্পিনার। সুতরাং ১নং চিত্রের কক্ষের খোপ '×' হবে, এবং পাশাপাশি সমস্ত খোপ 'o' হবে। ছয় নং সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, সিম্পসন এবং ওপেনার দুজন আলাদা লোক, সুতরাং ১নং ছকে ডান-দিকের ওপরের ঘর 'o' হবে। এখন ওপরের সারিতে একটা মাত্র ঘর ফাঁকা, ওটা '×' হতেই হবে। অর্থাৎ সিম্পসনই উইকেটকীপার এবং রিচার্ডসন ওপেনার।

দ্বিতীয় ধাঁধাটা একটু শক্ত। যেহেতু লাল এবং সবুজ ঘুঁটি সমান সংখ্যক, লাল সবুজ ঘুঁটি পাল্টাপাল্টি করলেও সমস্যাটা একই থেকে যাবে। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে একটা উত্তরই পাওয়া সম্ভব, লাল-সবুজ ওলটপালট করলেও উত্তরটা একই থাকবে যদি বরুণের কপালে একটা লাল আর একটা সবুজ ঘুঁটি থাকে।

বিস্ময়কর

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

প্রথমেই বলে রাখছি আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে এই রহস্যময় পৃথিবীর বুকে কত রকম অত্যাশ্চর্য ঘটনা যে ঘটতে পারে তা আমার জানার বাইরে। আমরা যাকে ভূত বলে ভয় পাই বৈজ্ঞানিকেরা তাকে বিজ্ঞান বলে মেনে নেন। এমন কিছু যুক্তি তারা প্রয়োগ করেন যাকে উড়িয়েও দেওয়া যায় না। ঠিক এই রকমই একটি অদ্ভুত ঘটনা আমি শুনেছিলাম দীপকের মামা ব্যোমকেশবাবুর মুখ থেকে। ঘটনাটা শোনার পর এক অদ্ভুত আতঙ্কে আমাদের সর্বাঙ্গে শিহরণ খেলে গিয়েছিল।

সেবার কি একটা কাজের জন্য ভাগলপুর যাওয়ার পথে এক রাত আমাদের দুমকায় কাটাতে হয়েছিল। আমরা তিন বন্ধু অবনী, আমি, দীপক ও দীপকের মামা ব্যোমকেশবাবু দুমকায় পৌঁছে একটি ডাকবাংলোয় আশ্রয় নিলাম।

তখন শ্রাবণ মাস।

একটু আগেই প্রবল বর্ষণ হয়ে গেছে। তাই ভিজে মাটি ও গাছপালার সবুজ ঘ্রাণে বাতাস ভরে আছে। দুমকা তখন এখনকার মতো এমন নোংরা শহর ছিল না। সাঁওতাল পরগণার এই সদর শহর ছিল কবির কাব্যের মতো সুষমাময়। আমরা ডাকবাংলো বুক করে দুমকার আশপাশ যতটা পারলাম ঘুরে নিলাম। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক যখন ঢেকে গেল তখন আবার এসে আশ্রয় নিলাম ডাকবাংলোতে। বাংলোর কেয়ারটেকারকে অনুরোধ করতে তিনি গরম ভাত আর মুর্গীর মাংসের ব্যবস্থা করতে রাজী হলেন!

ওদিকে যখন রান্নার আয়োজন চলছে আমরা তখন বাংলোর মধ্যে যে যার শয্যায় বসে নানা রকম গল্প কথায় মেতে উঠলাম। ব্যোমকেশ মামা একটা সিগারেট ধরালেন। আমি সিগারেট খাই না। অবনী আর দীপক সিগারেট খেলেও মামার সামনে সিগারেট ধরাবে কোন মুখে? ব্যোমকেশমামা সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে গেলেন জানালার কাছে। জানালার ফাঁক দিয়ে কন কনে ঝড়ো হাওয়া ঘরের ভেতর ঢুকছে তখন জানালার ফ্রেমের বাইরে অন্ধকার পাহাড় জঙ্গল। এমনই জমাট অন্ধকার যে সে দিকে তাকিয়ে কিছু দেখবার চেষ্টা করাও বৃথা। হঠাৎ বিদ্যুতের চমক নিয়ে গুড় গুড় করে মেঘ ডাকল। ব্যোমকেশ মামা সশব্দে জানালা বন্ধ করে গম্ভীর মুখে আমাদের সামনে এসে বসলেন। অনেকক্ষণ ধরেই

ব্যোমকেশ মামাকে কেমন একটু অন্য রকম লাগছে। মনে হচ্ছে কি যেন ভাবছেন। যে লোকটা আমাদের রান্না করছিল সে এসে চা আর টোস্ট দিয়ে গেল। লোকটি আদিবাসী। রান্না কেমন করবে কে জানে! ব্যোমকেশ মামা লোকটিকে বললেন—তোমাদের কেয়ারটেকারকে একবার ডেকে দাও তো।

লোকটা চা দিয়ে চলে গেল।

একটু পরেই কেয়ারটেকার এলেন। ভদ্রলোক বিহারী। কিন্তু ভালো বাংলা বোঝেন এবং বাংলা বলেন।

ব্যোমকেশ মামা বললেন—আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। মানে এই বাংলো সম্বন্ধে দু' একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে।

বেশ তো, করুন।

তার আগে আপনার নামটা জেনে রাখি।

আমার নাম অর্জুন যজোয়ারী।

তাহলে তো আপনি ব্রাহ্মণ!

আজ্ঞে হ্যাঁ। মিথিলার ব্রাহ্মণ আমরা।

আপনি কত দিন এখানে এসেছেন?

এই ধরুন বছর দশেক।

দশ বছর!

হ্যাঁ।

ব্যোমকেশ মামা তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—আপনি তো বছর দশেক আছেন, তার আগের, মানে আরো পাঁচ সাত বছর আগের কোন ঘটনা আপনার জানা আছে? মানে এই বাংলোর সম্বন্ধে!

চোখ বুজে একটু চিন্তার পর উত্তর এলো—না বাবু। কেয়ারটেকারের চোখে বিস্ময়।

আমরাও এবার রহস্যের গন্ধ পেয়ে পরস্পর পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে বেশ গুছিয়ে বসলাম।

ব্যোমকেশ মামা ঘরময় অকারণেই একবার পায়চারি করলেন। তারপর হঠাৎই একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন—আপনি আসার পর এই দশ বছরে বাংলোটায় একবারও হোয়াইট ওয়াস হয়েছে?

না।

ব্যোমকেশ মামা পায়চারি করতে করতে এক জায়গায় গিয়ে একটু থেমে দাঁড়ালেন। দেওয়ালের গায়ে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। তারপর ঘরের চারিদিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে কি সব দেখে বাথরুমে ঢুকলেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বললেন—আছে। আছে। সব ঠিক আছে।

তাঁর চোখে মুখে এমন এক উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠল যে আমরা সবাই খুব ঘাবড়ে গেলাম।

ব্যোমকেশ মামা বললেন—একটু কিছু মনে করবার চেষ্টা করুন তো। এই বাংলো সম্বন্ধে আপনি কিছু শুনেছিলেন কিনা?

হ্যাঁ শুনেছিলাম। যখন চাকরি নিয়ে এসেছিলাম তখনই শুনেছিলাম, এই বাংলোয় একবার নাকি খুন হয়েছিল। তিন বন্ধুর একজন খুন হয়েছিল এবং সেই অপরাধে বাকি দুজনের মধ্যে একজনের ফাঁসী হয়।

আর একজনের?

তা জানি না। তবে সেই ঘটনার পর থেকে এই বাংলোয় বহুদিন কোন লোকজন আসেনি। এখনো আসে না। এটাকে এবার ভেঙে আধুনিক ডিজাইনের হোটেল তৈরী করা হবে।

ব্যোমকেশ মামা কেয়ারটেকারের চোখের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন—আপনি তো এখানে দশ বছর আছেন বলছেন। এই বাংলোয় কোন উপদ্রব টের পেয়েছেন।

উপদ্রব!

হ্যাঁ। মানে আশ্চর্য রকমের কোন কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করেছেন কখনো? তারপর আরো সিরিয়াস হয়ে বললেন—মানে রাতের অন্ধকারে কোন কিছু··· ?

কেয়ারটেকারের মুখ দিয়ে এতক্ষণে হঠাৎই তার মাতৃভাষা বেরিয়ে এলো—ও সব পুরানা বাত ছোড় দিজিয়ে বাবুসাব। বলে আর একটুও না দাঁড়িয়ে চলে গেলেন তিনি।

আমরা সভয়ে ব্যোমকেশ মামার দিকে তাকিয়ে বললাম—কি ব্যাপার মামা! আপনি এখানে অশুভ কিছুর অনুমান করছেন নাকি!

ব্যোমকেশ মামা সে কথার উত্তর না দিয়ে ঘরময় অকারণেই একটু পায়চারি করে বললেন—না। তা ঠিক নয়। তবে বাংলোটা অভিশপ্ত। নাহলে দেখছিস না এখনো এর দুর্দশা ঘোঁচেনি।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি এর আগে এখানে এসেছিলেন নাকি মামা।

হ্যাঁ। আজ থেকে আঠারো বছর আগে। দেখবে? তার প্রমাণও আছে। ঐ দেখো দেওয়ালের গায়ে কি লেখা আছে। দেখে এসো।

আমরা সকলেই উঠে গেলাম। গিয়ে দেখলাম ছুরির

ডগা অথবা অন্য কিছু দিয়ে দেওয়ালের গায়ে খোদাই করা আছে তিনটি নাম। তিন বন্ধুর এই বাংলোয় অবস্থিতির অসভ্য স্বাক্ষর। দুটি নাম আমাদের অজানা। একটি নাম ব্যোমকেশ মামার।

ব্যোমকেশ মামা বললেন—আমাদের তিন বন্ধুর এক-জনের কাজ এটি। এই ভাবে দেওয়ালের গায়ে নাম লেখাটা খুবই খারাপ অথচ তবুও সে লিখেছিল। আসলে তার মধ্যে পাশব প্রবৃত্তি ছিল একটা।

কিন্তু তার সংগে খুন খারাপির ব্যাপারটা কি?

সেই কথাই তোমাদের আজ বলব। এই বাংলোয় আমার জীবনে সে এক দুঃস্বপ্নের রাত। আজ এতদিন বাদে এ পথে এসে তাই আর একবার এই বাংলোয় রাত কাটাবার কৌতূহল আমি চেপে রাখতে পারিনি। এবং সেই জন্যেই হোটেল ছেড়ে এই হতশ্রী বাংলোটাতে ওঠা। তোমরা শুনলে বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তবু তোমাদের বলব। সে এমনই এক ঘটনা যার কথা মনে পড়লে আজও আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। অনেকেই হয়তো বলবে এটা ভৌতিক ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু আমি মিলিটারী ম্যান। ভূত আমি বিশ্বাস করি না। অথচ নিজের চোখে যা দেখেছি তাকে কিছু নয় বলে উড়িয়েও দিতে পারি না আমি।

দীপক বলল—মামা, তখনও কি তুমি মিলিটারীতে কাজ করতে?

না। তবে পুলিসের লোক ছিলাম। আমি তখন রামপুরহাটে থাকতাম। সেই সময় আমরা তিন বন্ধুতে মিলে দেওঘর বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় এই বাংলোয় উঠেছিলাম আমরা রাত কাটাতে।

এমন সময় হঠাৎ খট খট করে জানলার পাল্লাটা শব্দ করে উঠল।

আমরা ভীত চোখে সে দিকে তাকালাম।

ব্যোমকেশ মামা বললেন—ও কিছু নয়। ঝড় উঠেছে।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই শোঁ শোঁ শব্দ। তারপরই শুরু হ'ল প্রবল বর্ষণ।

কেয়ারটেকার বলল—বাবু, আপনাদের খাবার রেডি। খাবার রেডি।

ব্যোমকেশ মামা বললেন—দিয়ে যেতে বলো। তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বললেন—খেয়ে দেয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়েই বাকিটা বলা যাবে তাহলে?

আমরা ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

যাইহোক। খেয়ে দেয়ে যে যার শয্যা গ্রহণ করবার পর শুরু হ'ল গল্প।

হ্যাঁ, সেই ভয়ঙ্কর রাতের গল্পটা তোমাদের বলি

ছবি পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

এবার। সেও ছিল এমনি এক ঝড় জলের রাত। আমরা তিন বন্ধুতে তিন দিকে শুয়ে ছিলাম। সুশান আমি আর গুরুং। এরা আমার বন্ধু হলেও আবাল্যের বন্ধু নয়। কর্মসূত্রে যোগাযোগ। কেউ কারো প্রকৃতি সম্বন্ধেও তাই খুব বেশি ওয়াকিবহাল ছিলাম না। যাইহোক। রাত্রি তখন কত তা জানি না। হঠাৎ একটা বিজাতীয় আর্তনাদ শুনে উঠে বসলাম আমরা। আমি সুশান এবং—। হ্যাঁ এবং। কেননা গুরুং উঠল না। আমরা ছুটে গেলাম ওর কাছে। ওর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার গুরুং! কি হয়েছে তোমার?

গুরুং আমাদের কথার কোন উত্তর না দিয়ে বার বার জানলার দিকে দেখাতে লাগল।

আমরা বন্ধ জানালা খুলে বাইরে টর্চের আলো ফেলেও কিছুই দেখতে পেলাম না—তাই ওর কাছে এসে বললাম—কই, কিছু তো নেই।

হ্যাঁ, অ্যাছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি তাকে।

কি করে দেখলে? জানালা তো বন্ধ। তাহলে নিশ্চয়ই তুমি স্বপ্ন দেখেছ। কেননা তুমি তো এখানে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলে।

গুরুং এবার হতাশভাবে বিছানায় শুয়ে নীরব হয়ে গেল।

আমরা আবার শয্যা গ্রহণ করলাম।

কতক্ষণ পরে তা খেয়াল নেই হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে শুনি বাথরুমের ভেতরে চক চক শব্দ। আমরা উঠে বসলাম। কিন্তু একি! জানালা খোলা কেন? গুরুং কই? গুরুং গেল কোথায়? আমরা আলো জেবলে রেখেই শুয়েছিলাম। তাই স্পষ্টই দেখতে পেলাম গুরুং এর শয্যা খালি। এবং জানালার পাল্লা দুটো খোলা। তাহলে কি গুরুংই উঠে জানালা খুলে রেখে বাথরুমে গেছে। কিন্তু এই ঠান্ডা আবহাওয়ায় জানালাটা খোলার কি দরকার ছিল ওর? আর বাথরুমের ভেতরে চক চক শব্দ করেই বা কি করছে?

আমি আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে বাথরুমের দরজা ঠেলে ভেতরে উঁকি দিয়েই চিৎকার করে উঠলাম। দেখলাম গুরুং কোথায়! একটা বৃহৎ জন্তু, অনেকটা ভালুকের মতো রোমশ আর নেকড়ের মতো দেখতে, বাথরুমের ভেতরে ঘোরাফেরা করছে। আমার চিৎকার শুনেই 'আঁক' করে আমার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেটা। আমি ভয় খেয়ে ঘরের কোণে আমার শয্যার পিছনে লাফিয়ে পড়লাম। সুশানও ভয়ে পিছিয়ে গেল। জন্তুটার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরোচ্ছে তখন।

সর্বনাশ। কোথা থেকে কিভাবে এখানে এসে পড়ল এটা? দরজা তো ভেতর থেকেই বন্ধ। জানালারও গরাদ দেওয়া। তাহলে? তাহলে কি ভৌতিক ব্যাপার? অথচ গুরুংই বা কোথায় গেল?

ভাববার অবকাশ নেই। একটু দেরি করলেই আমাদের দুজনকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে ওটা।

সুশানের পিস্তল গর্জে উঠল—গুড়ুম।

একটা বিকট চিৎকার করে অহেত নেকড়েটা শূন্যে লাফিয়ে উঠল একবার। তারপর রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেয় পড়ে ছটফট করতে লাগল। কিন্তু একি! কোথায় নেকড়ে? নেকড়ে কই? গুলি খেয়ে ছটফট করে সেই জন্তুটা তালগোল পাকাতে পাকাতে যখন স্থির হয়ে গেল তখন দেখলাম সেটার চেহারার পরিবর্তন ঘটে একটি আস্ত নরদেহতে পরিণত হ'ল। সবচেয়ে আশ্চর্য, দেহটি আর কারো নয়। গুরুং-এর মৃতদেহ! যার বুকে সুশানের বুলেট এখনো বিদ্ধ হয়ে আছে।

বাইরে তখন দরজায় ঘন ঘন করাঘাত হচ্ছে। লোকজন কেয়ার টেকার সবাই ছুটে এসেছে—দরোয়াজা খোলো! ক্যা-হুয়া বাবুজী! খোলো দরোয়াজা।

আমরা দরজা খুললাম!

লোকজন ভেতরে ঢুকল। তখন ব্রিটিশ আমল। থানা পুলিশ মিলে হৈ হৈ ব্যাপার। আমরা দুজনেই অ্যারেস্ট হলাম। আমি বহু কষ্টে ছাড়া পেলেও সুশানের ফাঁসীর আদেশ মকুব করা গেল না। অথচ বিশ্বাস করো সুসান খুনি নয়। ও আত্মরক্ষার জন্যই জন্তুটাকে গুলি করেছিল। গুরুংকে হত্যার জন্য নয়। কিন্তু এই সত্য আমরা কেউই প্রমাণ করতে পারলাম না।

এই পর্যন্ত বলে ব্যোমকেশমামা নীরব হলেন। আমরাও কোন যুক্তি দিয়ে এই ঘটনাকে কি আখ্যা দেব তা ভেবে পেলাম না। তবে সে রাতে আমরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা গিয়েছিলাম। কোন অবাস্তব কিছু ঘটেনি।

বিস্ময়ের নোট বই

আমেরিকান আদিবাসীরা রেকুন (ভল্লুক জাতীয় প্রানী বিশেষ) শিকার করে তার লোমশ লেজ দিয়ে টুপি বানিয়ে পড়ত। রেকুনের দল বসবাসের জন্য বেছে নিত মরুস্রোতা নদীর ধারের ঝোপঝাড়। তাদের বিচিত্র স্বভাব, যে কোন খাবার জলে ধুঁয়ে খাওয়া। ইদানীং গবেষনায় জানা গেছে, যখন রেকুন জলে সামনের দু'পা দিয়ে মাটার কাটে তখন খাবায় ধরা খাদ্য সামগ্রীর অবস্থান দেখে ভ্রম হয় খাবার পরিষ্কার করছে। দিনের বেলায় এরা গাছে বিশ্রাম নেয় এবং কাঠবিড়ালীর মত গাছে চড়তে ভালবাসে। এরা বুদ্ধিমান ও নিশাচর জীব।

বিষধর সর্প র‍্যাটল স্নেকের চেয়েও বিষধর কেউ আছে? শুনলে অবাক হবে সেই বিষধরটির নাম ব্ল্যাক উইডো - মাকড়সা। এর বিষের তীব্রতা র‍্যাটল স্নেকের ১৫ গুন আমাদের সৌভাগ্য এই মাকড়সা কামড়ে একবারে যতটা বিষ ঢালে তাতে মানুষের মৃত্যু হয়না।

আলবার্ট আইনস্টাইন

আলবার্টের কাকা জ্যাকব ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার।

কি হয়েছে, আলবার্ট?

দেখো না কাকু, অ্যালজেব্রা পড়ছি। একটুও ভালো লাগছে না।

কিন্তু অ্যালজেব্রা তো মজার জিনিস!

তাই বুঝি?

ব্যাপারটাকে এইভাবে ভেবে দেখ্। আমরা একটা খুদে পশু খুঁজতে বেরিয়েছি। পশুটার নাম জানিনা, অতএব তার নাম ধরে নিলাম 'এক্স'।

খুঁজতে খুজতে একসময় ওটাকে পাকড়াও করলাম। তখন তাকে আসল নাম দিলাম।

এমনি করে উত্তরটা পেয়ে গেলি! বুঝতে পারলি।

হ্যাঁ!

পরে আলবার্টের এক তরুণ বন্ধু ওকে কিছু বই দেয়।

তোমার জন্য দুটো বই নিয়ে এসেছি, হয়তো ভালো লাগতে পারে। একটা পদার্থবিদ্যার আর একটা জ্যামিতির।

অনেক ধন্যবাদ!

কয়েক সপ্তাহ পরে ...

ওহ্ ম্যাক্স, এই জায়গাটা একটু বুঝিয়ে দাও তো।

দুঃখিত আলবার্ট। পদার্থবিদ্যা আর জ্যামিতি তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি বোঝ।

কিন্তু স্কুলে আলবার্ট খুব মুস্কিলে পড়তো।
স্যার একটা প্রশ্ন করতে পারি ?
এখানে তুমি প্রশ্ন করতে আসোনি। বইয়ে যা আছে তা শিখতে এসেছো, আর যখন জিজ্ঞেস করা হবে তখন যেগুলো মুখস্থ বলবে।
স্কুল যেন সেনাবাহিনীর মতো। যা আদেশ হবে প্রত্যেককে তা পালন করতেই হবে।
আলবার্ট সেনা বাহিনী নিয়ে চিন্তিত।
আমরা অন্য কোথা ও চলে গেলে হয় না। এখানে থাকলে আমাকে সেনা বাহিনীতে ভর্তি হতেই হবে।
না খোকা, সেনা বাহিনীতে যাবি কি, তুই তো অনেক ছোট!
ও নিয়ে তোর এখন ভাববার কোন দরকার নেই।
ইতিমধ্যে ব্যবসা নিয়ে আলবার্টের বাবা বেশ মুস্কিলে পড়েছেন।
জার্মানীর অবস্থা ভালো নয়। ইটালিতে গেলে একটা চাকরি পাওয়া যেতে পারে।
তা হলে আমরা ইটালিতেই চলে যাই।

বিশ্বের বিস্ময়

চীনা বিজ্ঞানীরা ধানের তুষ থেকে এক রকম গ্যাস তৈরীর প্রনালী আবিষ্কার করেছেন। এই গ্যাস ডিজেলের পরিবর্তে ব্যবহার করা যাবে। জিয়াংসু প্রদেশের পাওয়ার জেনারেটিং ইকুইপমেন্ট ডিজাইন ইনস্টিট্যুট এই গ্যাসের উদ্ভাবক। আবিষ্কারকরা দাবী করেছেন এই গ্যাস সহজেই তৈরী করা যায়। এখানে দৈনিক গড়ে সাত টন ধান থেকে তুষ বার করা যায় এমন একটি কল বসানো হয়েছে। এটি মাত্র একটি ১৪০ কিলো ওয়াটের জেনারেটরের সাহায্যে চালানো হচ্ছে। এ থেকে যে বিদ্যুত উৎপন্ন হচ্ছে তার খরচ ডিজেল থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের চেয়ে ৬০ শতাংশ কম। চীনা সংবাদে আরো জানা যায়, এমন দুটি কল দক্ষিন আফ্রিকার সাহায্যার্থে বসানো হয়েছে যা চলছে ধানের তুষ দিয়ে।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ পাখির বাসা তৈরী করে ঈগল পাখিরা। শুনলে অবাক হবে, বৃহৎ যে বাসাটি পাওয়া গেছে সেটি আড়াই মিটার চওড়া এবং সাড়ে তিন মিটার দৈর্ঘ্য। আর ওজন? ওজন ১৮০০ কিলোগ্রাম।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গরম বেশী আফ্রিকা মহাদেশে। আফ্রিকার তিনটে সর্বোচ্চ পর্বত শিখরে আছে ৯৩ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপি গ্লেসিয়ার। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়াই হচ্ছে একমাত্র মহাদেশ যেখানে কোন গ্লেসিয়ার নেই। এর কারন বলতে গেলে অষ্ট্রেলিয়া পর্বতহীন মহাদেশ। পাশাপাশি নিউ গায়না ও নিউজিল্যান্ডেও অবশ্য গ্লেসিয়ার আছে।

পৃথিবীতে এমন সব ঘটনা ঘটে যার বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা চলেনা, বিজ্ঞানও সদুত্তর দিতে পারেনা……অথচ ভৌতিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না……এমনই রহস্যময় সত্য ঘটনা……

ইউ এফ ও | সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

আজও রহস্য

পৃথিবীতে যে কত রকম আশ্চর্য রহস্য আছে তার হিসেব আজও কেউ করে উঠতে পারেনি। কোন কোন রহস্যের হয়ত শেষ পর্যন্ত কিনারা হয়েছে, তবুও আজও যা রহস্য হয়েই থেকে গেল তার সংখ্যাও কম নয়। এমন একটা আশ্চর্য রহস্য হলো 'ফ্লাইং সসার' বা 'উড়ন্ত চাকি।' সারা দুনিয়ায় অবশ্য একে আনআইডেন্টি-ফায়েড ফ্লাইং অবজেক্টস বা ছোট্ট করে ইউ এফ ও বলা হয়।

এই উড়ন্ত চাকি নিয়ে দুনিয়ায় কম হৈ চৈ ওঠেনি। সারা দুনিয়ার মানুষই এটা নিয়ে দারুণ মাথা ঘামাতেও ছাড়েনি। আসলে সপ্তাহে এমন দিন যায়নি যেখানে উড়ন্ত চাকি খবর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মাথা ঘামালে কি হবে, রহস্য রহস্যই থেকে গেছে। আসলে জিনিসটা যে কি হতে পারে সে সম্বন্ধে কেউ বা কোন দেশই একমত হতে পারেনি।

উড়ন্ত চাকি বা ইউ এফ ও তাহলে কি? এগুলো কি ভিনদেশী কোন গ্রহের উড়োজাহাজ? নাকি শত্রুদেশের গোয়েন্দা বিমান? নাকি মহাশূন্য থেকে আসা সাংকেতিক কোন কিছু? এসব প্রশ্নের আজও ঠিক ঠিক উত্তর কেউ দিতে পারেনি। উড়ন্ত চাকি তাই মানুষের কাছে একদিকে যেমন রহস্যের খোরাক তেমনই আবার অনেকের কাছে ভয়েরও ব্যাপার। এ নিয়ে কত যে গল্প, প্রবন্ধ আর সিনেমাও তোলা হয়েছে তার শেষ নেই। অনেকে আবার সব ব্যাপারটাই বুজরুকি বলেও উড়িয়ে দিতে চায়। তাদের মত হলো সবটাই চালাকি।

কি রকম ভাবে উড়ন্ত চাকির ব্যাপারটা জন্ম নিলো? ১৯৫৭ সাল নাগাদ উড়ন্ত চাকির ব্যাপারটা প্রথম মানুষ জানতে পারে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী শহরের কাছে এক চাষী তার ক্ষেতের কাছেই বিরাট চাকার মত কিছু মাটিতে নামতে দেখে। সে কাছাকাছি এগিয়ে যেতেই জিনিসটা সাঁ করে আকাশে উঠে মিলিয়ে যায়। এরপর থেকে পৃথিবীর নানা দেশের আকাশে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখতে পায় অনেকে। কেউ দেখে বিরাট লাট্টুর মত উজ্জ্বল কিছু, কেউ বা একটা পিরীচ বা দুটো উল্টে রাখা ডিসের মত, কোনটা লম্বা বা তিন কোণা। জিনিষ-গুলো নাকি বিদ্যুৎবেগে আকাশের বুকে মিলিয়ে যেতে দেখা যায়। এর অনেকগুলো আবার রুপোর মত চকচকে। নানা রকম গুজব এরপর জন্ম নিলো। সবারই মনে প্রশ্ন হলো এই জিনিসগুলো তাহলে সত্যিই কি হতে পারে?

কেউ বললে ভিনগ্রহের উড়োজাহাজ, কেউ হেসে উড়িয়ে দিয়ে জানালো ওগুলো স্রেফ উল্কা। কিন্তু আরও গোলমেলে হয়ে উঠলো সব ব্যাপার যখন কেউ কেউ দাবী করলো ওগুলো সত্যি সত্যিই ভিনগ্রহের আকাশ যান তাদের দাবী প্রমাণ করবার জন্য তারা নানা ঘটনার কথাও জানাতে ছাড়েনি। একজন দাবী করেছিল ভিনগ্রহ থেকে আসা একটা উড়ন্ত চাকির প্রাণীরা তাকে পাকড়াও করে নিয়ে যায়। ঘটনাটা ১৯৭৫ সালের ৫ই নভেম্বরের, বলতে গেলে এই সেদিনের ব্যাপার। ঘটনাটা আমেরিকায় ঘটে। ট্রেভিস ওয়ালটন নামে একজন লোক বন্ধুদের সঙ্গে একটা ট্রাকে করে ফিরছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেলো উড়ন্ত চাকির মত কিছু ওর সামনেই আকাশ থেকে নেমে এসেছে। ট্রেভিস ট্রাক থেকে নেমেই ওটার কাছে ছুটলো। আচমকা উজ্জল একটা আলো জিনিসটা থেকে ছুটে এসে ধাক্কা মারতেই ট্রেভিস ছিটকে পড়লো। ওর বন্ধুরা ভয়ে ছুট লাগালো। পুলিশও ট্রেভিসকে খুঁজে পায়নি। সে হঠাৎই আবার ৫ই নভেম্বর হাজির হয়ে অদ্ভুত একটা গল্প শোনালো! কিছু অদ্ভুত আকৃতির প্রাণী নাকি ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। কেউ অবশ্য ওর কথায় কান দেয়নি।

অনেক পাইলটও জানিয়েছে তারা প্লেন নিয়ে উড়তে উড়তে কাছাকাছি উড়ন্ত চাকি দেখেছে। সেগুলো নাকি দারুণ বেগে সাঁ করে প্লেনের পাশ দিয়ে উড়ে গেছে। ১৯৬৯ সালে আমেরিকার ওহিওতে দুজন পাইলট এ রকম দেখে। জনসন নামে একজন লোক তার স্ত্রী আমেরিকার কানসাস শহরে একটা উড়ন্ত চাকি থেকে 'নেকড়ের মত' একটা মেয়েকে নামতে দেখে।

আমাদের দেশেও উড়ন্ত চাকি কম হৈ চৈ তোলেনি। এই কিছুকাল আগে মাত্র ১৯৭৯ সালের ১১ই জুলাই, ভোরবেলা পশ্চিম বাংলার পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর গ্রামটা কাগজের শিরোণাম হয়ে উঠেছিল। এখানে ভারি আশ্চর্যজনক একটা কাণ্ডই ঘটে যায়। ওইদিন আকাশ ফুঁড়েই যেন দারুন উজ্বল কিছু কতকগুলো কুঁড়েঘর আর একটা স্কুল বাড়ির উপর এসে পড়ে। অনেকেই দেখেছিলো বিরাট লাল আগুনের গোলায় মত কিছু আকাশ থেকে এসে আছড়ে পড়ে। ব্যাপারটা যে কি কেউ বুঝতে পারলো না। কাগজে ঢের হৈ চৈ হলো কিন্তু রহস্য রহস্যই থেকে গেলো। অনেকেই কিন্তু ব্যাপারটাকে উড়ন্ত চাকি বলেই ভেবেছিলো, কোন কোন খবরের কাগজেই তাই লেখা হলো।

ইউএফও রহস্য তাই আজও রহস্য হয়েই আছে, যদিও এই রহস্যময় জিনিসের ঢের ছবিও তোলা গেছে। একবার ব্রাজিলে নাকি এরকম কোন উড়ন্ত চাকি খুঁজেও পাওয়া যায়। সেটা পরীক্ষায় দেখা যায় জিনিষটা নির্ভেজাল কোন ধাতুতে বানানো যা পৃথিবীতে সম্ভব নয়। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

উড়ন্ত চাকি নিয়ে এতো গুজবের জন্ম হওয়ায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র-এ ব্যাপারে একবার জোরালো খোঁজ খবর আর তদন্ত করাও হয়। তদন্ত করে শেষপর্যন্ত জানানোও হলো ইউ এফ ও'র মধ্যে কোন রহস্য মোটেই নেই। ওগুলো আসলে উল্কা, ধূমকেতু, রকেট বা আবহাওয়া বেলুন ইত্যাদির মতই কিছু।

এসব সত্বেও কিন্তু উড়ন্ত চাকির রহস্য আজও রহস্যময় হয়েই থেকে গেছে। সত্যিকার সমাধান কিন্তু কোন দেশই করতে পারে নি এ ব্যাপারে। ভবিষ্যতের বিজ্ঞান হয়তো পারবে।

এডিসনের ফিলামেন্ট আবিষ্কার:

ইলেকট্রিক আলোর বালব-এর জন্য ফিলামেন্ট আবিষ্কার করতে গিয়ে টমাস আলভা এডিসন অন্ততপক্ষে ৬০০০টি বিভিন্ন পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা চালিয়েছিলেন। এমন কি বাশের আঁশও তিনি বাদ রাখেননি। অবশেষে এল ১৮৭৯ সেই দিনটি, অঙ্গারিত তুলোর সুতো আবিষ্কার করলেন—যা ৪০ ঘন্টারও বেশী জ্বলল।

মাতন বাঁশি

চন্দ্রভানু ভরদ্বাজ

শহরটা ছোট্ট। তিন দিকটাই পাহাড়ে ঘেরা। মাথার ওপর খোলা নীল আকাশ আর দূরে দূরান্তে বিস্তৃত পর্বত শ্রেণীর মাঝখানে খেলনার মতো বাড়ি দিয়ে সাজান এই ছোট্ট শহরটা সদা-চঞ্চল। চঞ্চল, কারণ স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়াও শহরটাতে বাইরের মানুষের আনাগোনা লেগেই আছে। ব্যবসাদার, প্রকৃতি-প্রেমিক বা ধর্মভীরু—সব ধরণের মানুষের ভিড়ই লেগে থাকে শহরটাতে প্রায় সারা বছরটাই। হিমালয়ের গা ঘেঁসে হলেও এখানকার শীতটা এমন কিছু হাঁ করা কামড় দেয় না যে শহরের লোকগুলো তাদের বাড়ি-ঘর-দোর ছেড়ে নেমে যাবে নিচে নিরাপদ আশ্রয়ে এবং অন্য অনেক উঁচু পাহাড়ি শহরের তুলনায় এখানকার আবহাওয়া বেশ মনোরম।

শহরটার তিনদিকের যে পাহাড়, তার দুদিকে দুটো পাহাড়ই বেশ কিছুটা দূরে, যদিও দেখলে মনে হয় কাছেই। আর পূবদিকের পাহাড়টার গায়ে একটুখানি সমতল জায়গায় এই শহর। ওই পাহাড়টা অপেক্ষাকৃত ছোট। শহরটাতে বেশির ভাগই কাঠের বাড়ি। পাকা বাড়িও আছে অবিশ্যি। পাকা সড়কও আছে একটা যা ধরে হালে আসছে দূরান্তের বাস-ট্রাক-লরী। সড়কটা শহরকে ঘিরে পূব-দক্ষিণ কোন বরাবর চলে গেছে। শাল-পাইন-ইউক্যালিপটাস-চিনারের সবুজ-বাদামী রংয়ের ছোপের মধ্যে মধ্যে রংবেরং-এর সাজান বাড়ি ঘর আর মেঘ কুয়াশার আলোছায়া—সব মিলিয়ে শহরটাকে আমার ভালই লাগছে।

এখানে এসেছি আমি বেশ কিছুদিন। সরকারী জরিপের কাজে। আমার কাজ অবশ্য শহরে নয়। শহর পেরিয়ে দূরে পূবদিকের বেঁটে পাহাড়টার খাঁড়াই গা বরাবর বন আর পাথরের দুর্গম জায়গায় আমাকে কাজ করতে হচ্ছে। পাহাড়টাকে স্থানীয় লোকেরা বলে 'ভাওকী।' এদিকটাতে বিশাল উঁচু উঁচু গাছের জঙ্গল আছে। আছে নানা ক্যাকটাস আর আগাছার ভিড়। তবু এখানে কাজ করতে আমার ভাল লাগছে। চারদিকে ধ্যানগম্ভীর পাহাড়ি পরিবেশটুকু ভারি সুন্দর। এদিকে লোকজন বিশেষ আসে

না। ভাওকী পাহাড়ের খাড়াই গায়ের সামনে বিশাল এক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে! তার চারদিকটাই বন-জঙ্গল গাছপালায় ছাওয়া। একটু দূর দিয়ে একটা ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট দামাল মেয়ের মতো নাচতে নাচতে, ছুটতে ছুটতে, লাফাতে লাফাতে একরাশ সাদা ফেনার ওড়নার আড়ালে সে কোথায় কতদূরে নেমে গেছে জানি না।

মন্দির চত্বরটাতে আমি বসে থাকি মাঝে মাঝে। অবসরে এই জায়গাটায় বসে থাকতে আমার বড় ভাল লাগে।

এই মন্দিরের কথা শুনেছিলাম আগেই। অনেক কিংবদন্তী, অনেক গল্প, অনেক কাহিনী মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে এই মন্দির ঘিরে। এখন অবশ্য দেখবার মতো কিছুই নেই। পড়ে আছে বিশাল বিস্তৃত এক বাঁধান চাতাল। বড় বড় পাথরের মসৃন চৌকো টুকরো দিয়ে গাঁথা। মাঝখানে মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। এখানে বসে থাকতে থাকতে মন্দিরটার একটা ছবি আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। বিশাল উঁচু চূড়ো, তার চারদিকে মোটা মোটা থাম—দারুণ কারুকার্য করা—এমনি একটা ছবি ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে। কারুকাজ করা কালো পাথরের টুকরো এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে এখানে সেখানে, তার ফাঁকে ফাঁকে গাছ গজিয়ে গেছে।

এখানে বসে থাকতে একেক সময় আমার খুব খারাপও লাগে। অতীতের কত ঘটনা, কত জীবন-মরনের নীরব সাক্ষী এই ভাঙা মন্দির। কিন্তু এই ভাঙা পাথরের স্তূপটুকু আজ পরিত্যক্ত। কয়েক বছরের মধ্যে এটুকুও থাকবে না। আমি—আমিই তার ব্যবস্থা করবার জন্যে এসেছি। মন্দির সমেত ওই পাহাড়টাতে ফাটল ধরিয়ে নতুন রাস্তা তৈরি হবে—আর সেই রাস্তার ছক তৈরি করছি আমি।

মন্দিরটাকে স্থানীয় লোকেরা বলে 'মাতন মন্দির।' 'মাতন' কথাটা মার্তণ্ডের অপভ্রংশ—তার মানে আসলে ওটা সূর্য্য-মন্দির। কতদিন এমনি ভাবে পড়ে আছে সঠিক আমি জানি না। শহরটাতে অবশ্য আরেকটা সূর্য্য মন্দির আছে, তবে সেটা হাল আমলে তৈরি। সেখানে অনেক পুন্যার্থী ভিড় করে। কিন্তু এদিকে বিশেষ কেউ আসে না! এখানকার আদি বাসিন্দারা জায়গাটাকে একটু এড়িয়ে চলে। অথচ সবাই বলে, জায়গাটা দারুণ পবিত্র, সূর্য্যদেব নাকি ভীষণ জাগ্রত ছিলেন। যখন আমি একা একা এখানে বসে থাকি, আমারও কখনো কখনো গাটা কেন জানি না ছম ছম করে ওঠে। জায়গাটা সুন্দর, ভীষণ সুন্দর, কিন্তু কেমন একটু ভয়ংকরের ছায়া মিশে আছে সে সৌন্দর্য্যে—লংকা বাটার শিলে পেশা নারকেলের স্বাদের মতো। রাহুলজী অবশ্য বলেন, এ আমার মনের ভুল, মনের দুর্বলতা।

এ শহরে ঠাঁই নেবার পর এখানকার অনেক লোকের সঙ্গেই আমার আলাপ পরিচয় হয়েছে। রাহুলজীর সঙ্গে কিন্তু আলাপ হয়েছে এখানে, ওই মন্দির চত্বরেই। ওঁর পুরো নাম আমি জানি না। সকলেই ওঁকে ওই নামেই ডাকে, আমিও তাই বলি। উনি ঠিক কী করেন আমি বুঝতে পারি না। শহরে ওঁর বাড়ি আছে। বেশ অবস্থাপন্ন লোক। সকলেই খুব সমীহ করে। অনেকের কাছে শুনেছি প্রচণ্ড জ্ঞানীগুণী লোক। আর এখানকার এক প্রাচীন বংশের বংশধর উনি। আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি না উনি আসলে কী!

শহরে বাড়ি থাকলেও উনি প্রায়ই ওই ভাওকীর বনে, ওই মন্দির চত্বরে ঘুরে বেড়ান। একদিন ওই ঝরনাটার ওধারে এক গুহার মধ্যে থেকে ওঁকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। অথচ ওদিকটাতে মানুষজনের যাতায়াত একেবারেই নেই। বুনো জন্তু জানোয়ারও থাকতে পারে দু-একটা।

আমার সঙ্গে খুব একটা খারাপ ব্যবহার উনি করেন নি। বরং ভাল ব্যবহারই করেছেন। কিন্তু আমাকে একেবারেই পছন্দ করেন না, সেটা বুঝি। বলা উচিৎ আমার কাজটাই ওঁর অপছন্দ। আমার দিক থেকে গোপনীয়তা থাকলেও উনি ঠিকই বুঝেছেন আমি কী জন্যে এখানে এসেছি। প্রায় প্রতিবারই যখনই দেখা হয়েছে, উনি আমাকে নানাভাবে বোঝাতে চেয়েছেন, ওই পবিত্র মন্দির চত্বর বা ওই ভাওকী পাহাড়ের চূড়ো— এর ওপর আমাদের মতো সাধারণ মানুষের হস্তক্ষেপ করা উচিৎ নয়। আমি চুপ করে শুনেছি ওঁর কথা।

স্থানীয় লোকেরাও কেন জানি না আমাকে কিছুটা এড়িয়ে চলে। মনে হয় সেটাও ওই মন্দির অঞ্চলে, আমি বিদেশী—ঘোরাঘুরি করি, জিপ নিয়ে, লোকজন নিয়ে মাপ জোক করে বেড়াই—সেটা ওদের পছন্দ নয় বলেই। ওরা বিশ্বাস করে ওই মন্দির অঞ্চল অপবিত্র হলে মাতন-তূর্য্য আবার বেজে উঠবে।

এখানকার কিংবদন্তী বলে এই মন্দির যখনই অপবিত্র

হয়েছে, বেজে উঠেছে ওই মাতন-সূর্য্য বা সূর্য্যদেবের বাঁশি আর ধ্বংস হয়ে গেছে সব কিছু। স্থানীয় লোকেরা সেই ধ্বংসের সেই বাঁশির আওয়াজের ভয় আজো পায়। আমি অবশ্য ওসব সংস্কারে বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয়, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় আর দেবতার মহিমা—দুয়ে মিলেই এই সব প্রাচীন গল্পের উদ্ভব হয়েছে।

সেদিন আমি রাহুলজীকে ওই কথাই বললাম। উনি হাসলেন। ওঁর ভাষায় বললেন, 'নাবালক, তোমরা কিছুই বিশ্বাস করতে পারো না।' তারপর কিছুটা অন্যমনস্ক-ভাবে বললেন, 'শোন তোমাকে ওই মন্দিরের গল্প বলি।'

আমরা বসেছিলাম মন্দির চাতালের পশ্চিম কোণে। বিকেলের লালচে রোদ্দুর এসে পড়েছিল রাহুলজীর সাদা দাড়িতে।

রাহুলজীর গল্প ঃ

এই মন্দির কত প্রাচীন তার কোন লেখা জোকা নেই। মন্দিরে আজ কিছুই নেই। কিন্তু একদিন সবই ছিল। এই মন্দির ঘিরে বিশাল বর্ধিষ্ণু এক জনপদ ছিল। বিখ্যাত ছিল এখানকার সদা জাগ্রত সূর্য্যদেব। বিশাল সোনার মূর্তি, আট ঘোড়ার রথে বসা। আর বিখ্যাত ছিল ওই সূর্য্য-বিধান। সেই আশ্চর্য্য বাঁশি রাখা থাকত মন্দির চত্বরের বাইরে, আলাদা এক চার থাম্বাওয়ালা কক্ষে। সবাই সেই বাঁশি বাজাতে পারত না। পারত শুধু একজন। এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। তাঁকে আচার্য্য বলে মান্য করত সবাই। দীর্ঘদিনের অনুশীলনে, যথেষ্ট পরিশ্রমে ওই ভেরী বাজাতে শিখতে হত এ মন্দিরের প্রধান পুরো-হিতকে। এ প্রথা ছিল বংশানুক্রমিক।

কিন্তু সব সময় বাজত না সেই তূর্য্য। আরো তূর্য্য রাখা থাকত মন্দিরের বাকি তিনটি কোণে। উৎসব অনুষ্ঠানে বাজান হত সেগুলো। কিন্তু ওই সূর্য্য বিধান বাজাবার কোন প্রয়োজন সচরাচর হত না। এ কথা সত্যি যে ওই ভেরী ছিল ধ্বংসের দূত। যখন পাপ আর অনাচার এসে ছেয়ে ফেলত ওই জনপদ, তখনই সূর্য্যদেবের নির্দেশে সেই সময়ের প্রধান পুরোহিত বাজাতেন ওই শিঙা। কিন্তু সে প্রয়োজন হত হয়তো কয়েক শত বৎসরে একবার। এমনি ভাবে বার বার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ওই মন্দির সংলগ্ন জনপদ দেবতার রোষে—নতুন মানুষ আবার গড়ে তুলেছে নতুন নগর।

শেষ সেই তূর্য্য বেজেছিল কয়েকশো বছর আগে। তখন ওই গোটা অঞ্চলটা, এই পুরো পাহাড়ি রাজ্যটা শাসন করতেন স্বাধীন রাজা সোমাদিত্য। তাঁরই নিকটাত্মীয় বসুমিত্র দেখাশোনা করতেন ওই সূর্য্য মন্দিরের সংলগ্ন নগর অঞ্চল। কিন্তু নগরপাল হিসেবে বসুমিত্র ছিলেন ভীষণ অত্যাচারী, বিলাসী, স্বৈরাচারী। প্রজাদের সকলেই ভয় পেত তাঁকে। বিলাসে ডুবে থাকতে থাকতে প্রায়ই তাঁর ধনভাণ্ডার শূন্য হয়ে পড়ত। তখনই নতুন ভাবে অত্যাচার বাড়ত প্রজাদের ওপর। তাঁর পারিষদরা, তাঁর সৈন্য-সামন্ত কারোরই সে অত্যাচারের প্রতিবাদ করবার সাহস ছিল না। একমাত্র সূর্য্য মন্দিরের তদানীন্তন আচার্য্য প্রজ্ঞাশঙ্কর বসু মিত্রকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন, সৎপথে চলবার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু সে কথায় কাণ দেবার মানুষ ছিলেন না বসুমিত্র। বসুমিত্রের অত্যাচার ক্রমাগত বেড়েই চলছিল।

একদিন সকালবেলা আচার্য্য মন্দিরে এসে দেখলেন, মন্দিরের প্রধান দরজা খোলা। প্রত্যেক দিনই উনি ভোর-বেলা আসেন প্রাতঃকালীন পূজা করতে! কিন্তু এ কেমন হল? আশ্চর্য্য হবার চেয়ে বেশি ভয় পেলেন আচার্য্য। দ্রুত পায়ে মন্দিরের অন্তরকক্ষে এলেন আচার্য্য। তারপরই বিমূঢ় হাহাকারে ভেঙে পড়লেন তিনি। নেই—সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন সূর্য্যমূর্তি নেই। শূন্য মন্দির গর্ভে শূন্য দেবতার আসন যেন তাড়া করে এল আচার্য্যকে। সঙ্গে সঙ্গেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন তিনি।

জ্ঞান ফিরতে খোঁজ করে দেখলেন, মন্দিরের আটজন রক্ষীর মধ্যে ছয়জন নিখোঁজ আর দুজনের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে আছে মন্দিরের পিছন দিকে।

বসুমিত্রের কাছে নিজে এলেন আচার্য্য। খুব শান্ত-ভাবে সবকিছুই শুনলেন বসুমিত্র। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'তাহলে শেষ পর্য্যন্ত মূর্তিটা সরিয়ে ফেলতে পারলেন, আচার্য্যদেব?'

'তার মানে?' বিস্ফারিত চোখে বিহ্বল আচার্য্য বসু মিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী বলছ তুমি বসুমিত্র?'

'বলছি, লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের ওই স্বর্ণমূর্তি চুরি করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না?'

সকলের সামনে এই অপমান, ওই মিথ্যা অপবাদ সহ্য করতে পারলেন না আচার্য্য। উত্তেজিত হয়ে বললেন,

'শোন, বসুমিত্র, এক নিরপরাধ পূজারীকে তুমি আজ মিথ্যে দোষারোপ করছ, দীর্ঘদিন ধরে তোমার সন্তানের মতো প্রজাদের ওপর অত্যাচার করেছ। শেষ পর্যন্ত ক্ষমতান্ধ হয়ে আজ তুমি দেবতার অসম্মান করলে,—এর ফল ভাল হবে না। নির্বংশ হবে তুমি। তুমি জান না, সূর্য্যদেবের মূর্তি চুরি গেছে। কিন্তু সূর্য্যভেরী আছে আমার কাছে। বংশ বংশ ধরে আমরা এই মন্দিরের পূজারী। কিন্তু এ রাজ্যে তুমি আগন্তুক মাত্র। এর আগেও প্রয়োজনে ওই ভেরী বেজেছে—ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সব কিছু। আবার ওই ভেরী বাজবে—তুমিও শেষ হয়ে যাবে, ওই লোকালয়, এই সব কিছু ধ্বংস হবে শুধুমাত্র তোমারই পাপে।'

বসুমিত্র কিন্তু নির্মমভাবে বললেন, 'আপনাকে একদিন একরাত্রি সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে যদি ওই মূর্তি ফিরিয়ে না দেন, তাহলে সপরিবারে আপনাকে নিধন ক'রে নতুন পুরোহিত নিয়োগ করব আমি। প্রয়োজন হলে নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করব।'

মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলেন আচার্য্য! নিজের বাড়িতে এসে দেখলেন, পলাতক রক্ষীদের একজন বসে আছে তাঁরই অপেক্ষায়। তার কাছে শুনলেন আসল ঘটনা। বসুমিত্রের লোকেরাই নিয়ে গেছে ওই মূর্তি। অর্থভাণ্ডারে টান পড়তে সেই পিশাচ শেষ পর্য্যন্ত হাত বাড়িয়েছে দেবতার দিকে। প্রচণ্ড ক্রোধে কেঁপে উঠল আচার্য্য প্রজ্ঞাশঙ্করের সমস্ত শরীর। বুঝলেন, বসুমিত্র বিশ্বাস করে না ওই মরণভেরীর শক্তির কথা, দেবতার মহিমার কথা।

সে সময়ে সূর্য্য মন্দিরের আচার্য্যের নিজস্ব রক্ষী-বাহিনী থাকত। সেই রক্ষীবাহিনীর সাহায্যে সেই দিনই খুব গোপনে আচার্য্য তাঁর পুরো পরিবারকে পাঠিয়ে দিলেন নগর থেকে দূরে নিরাপদ গোপন আশ্রয়ে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরে নিরীহ আচার্য্যর দিকে নজর দেবার কোন প্রয়োজন বোধ করেন নি বসুমিত্র। শাসিয়ে ভয় দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়েছিলেন। ওই নিরীহ পূজারী যে সত্যি কোন অমঙ্গল ডেকে আনতে পারেন, তা একেবারেই ভাবেন নি গর্বিত বিলাসী বসুমিত্র।

তখন মধ্যরাত্রি। সারাদিনের ক্লান্ত নগরপাল ঘুমিয়ে আছেন। সারা নগরীও নিদ্রিত। হঠাৎ বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে বেজে উঠল মারণভেরী। ধীরে ধীরে অতি উচ্চগ্রামে বাজতে লাগল সেই প্রলয়সংগীত। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল মৃত্যুর বীভৎস সুর। এমন বাজনা কেউ কোন দিন শোনে নি আগে। আর কী আশ্চর্য্য, সেই ভেরী বেজে উঠবার পরই শুরু হল তাণ্ডব। ঠিক যেন ভূমিকম্প। ভেঙে পড়তে লাগল ঘর বাড়ি। চুরমার হয়ে গেল প্রাসাদ। পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে এল বিরাট বিরাট প্রস্তরখণ্ড। লোকজন হাহাকার করতে করতে বেরিয়ে এল পথে। 'থামাও-থামাও' আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কিন্তু সেই ভয়াবহ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচল না কেউই। ঠিক ওই খাঁড়াই পাহাড়ের গা ঘেঁসে ছিল নগরপালের প্রাসাদ। সে প্রাসাদ খণ্ড-খণ্ড হয়ে তলিয়ে গেল অতল খাদে। এমন কী ওই মন্দিরও ভেঙে পড়ল শেষ পর্য্যন্ত। বোধহয় দেবতার মূর্তির স্থানচ্যুতির জন্যই দেবতার রোষ থেকে রেহাই পেল না অপবিত্র মন্দির। মাত্র একরাত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সব কিছু। বছরের পর বছর পরিত্যক্ত হয়ে থাকতে থাকতে জঙ্গল আর আদিম পাহাড় গ্রাস করে নিল সব। শুধু জেগে রইল ওই ভাঙা মন্দির চত্বর!

পরের কথা :

'কী বিশ্বাস হ'ল না তো আমার কথা?'—রাহুলজী চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে!

বিশ্বাস সত্যি হয় নি। আমি চুপ করে রইলুম। নিজের মনেই বললেন রাহুলজী, 'এসব কথা আমিও বিশ্বাস করতুম না তোমার মতো জোয়ান বয়সে। কিন্তু এখন আমি বিশ্বাস করি। তুমি কী বিশ্বাস করবে, সেই মারণ-ভেরী এখনো আছে। এখনো তা বাজালে ওই সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, প্রলয়কাণ্ড ঘটে যাবে তক্ষুনি!'

আমি বৃদ্ধের দিকে চেয়ে দেখলুম ভালভাবে। সন্ধ্যার নেমে আসা অন্ধকারের মধ্যে ধক ধক করে জ্বলছে রাহুল-জীর উজ্জ্বল চোখদুটো। মৃদু গলায় বললাম, 'কিন্তু ওসব কথা আপনি জানলেন কেমন করে? কোথাও কোন ইতিহাসেই তো পড়ি নি এসব কথা কখনো।'

আমার কথার উত্তর দিলেন না রাহুলজী। স্থির শ্বাপদের দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তোমার কাজ তো শেষ হয়ে গেছে! আমি তোমাকে বার বার নিষেধ করেছিলাম। সড়ক বানাবে তোমরা! কী লাভ হবে? তার আগেই সব ওলোট-পালট হয়ে যাবে।'

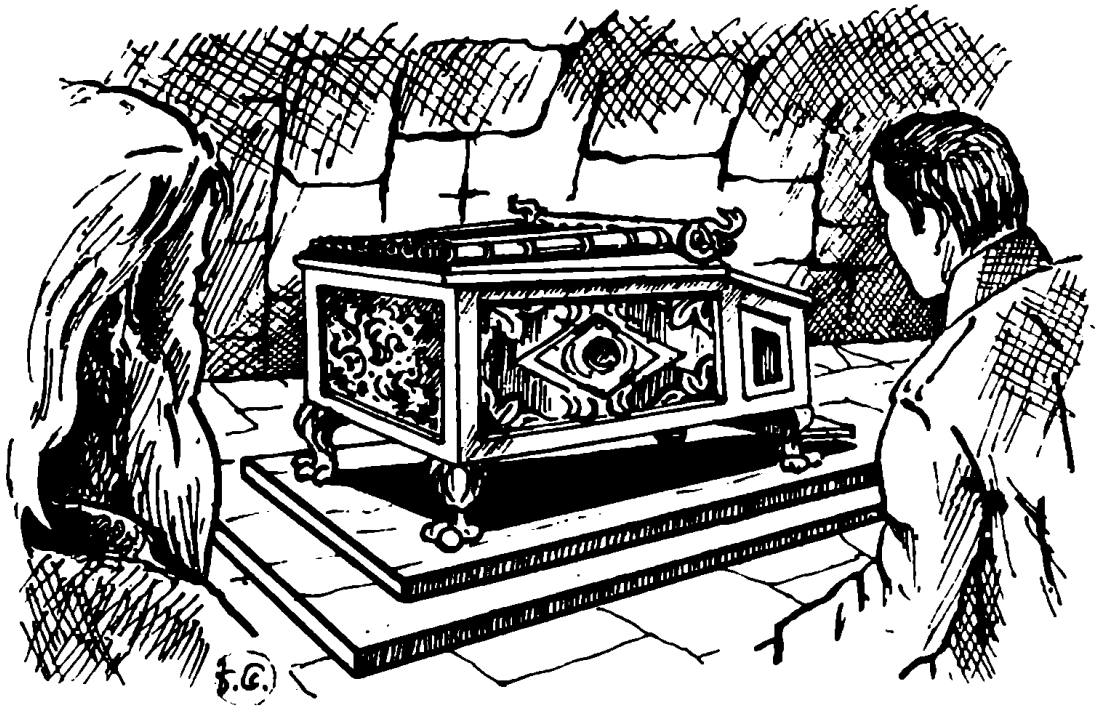

আমি বললাম, 'কিন্তু রাহুলজী, আমি তো আজ্ঞাবহ কর্মচারী মাত্র। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে, চলে যাব এখান থেকে। তারপর সড়ক হবে কী হবে না, সে বুঝবে সরকার। আর আপনি মন্দিরের কথা বলছেন, ওই চাতালটুকু ছাড়া কিছুই তো নেই।' রাহুলজী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দেখবে তুমি সেই সূর্য্যভেরী? কাল সকালবেলা ওইখানে এসে, আমি তোমাকে নিয়ে যাব।'— আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই রাহুলজী হন হন করে চলে গেলেন ঝরনার দিকে।

শহরে ফিরে আসবার পর সারা রাত্তির ঘুম হল না। রাহুলজীর সঙ্গে দেখা করব কিনা বুঝতে পারছি না। লোকটার একটা কোন স্বার্থ নিশ্চয় আছে ওই কাজটা বন্ধ করার মধ্যে। এবং সে স্বার্থ যদি বড় মাপের হয় তাহলে আমার পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে টানাটানি হতে পারে। তবু শেষপর্যন্ত পরের দিন সকালে কোমরে একটা পিস্তল ঝুলিয়ে তার ওপর ওভারকোট ঢেকে গিয়ে হাজির হলুম মন্দির চত্বরে।

রাহুলজী অপেক্ষা করছিলেন। একাই।

মন্দির ছাড়িয়ে সেই ঝরনাটা পেরিয়ে এগিয়ে চললুম আমরা। সারা পথে একটিও কথা বললেন না রাহুলজী। বড় বড় দুটো পাইন গাছ পেরিয়ে ভাঙকী পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটলের মুখে এসে দাঁড়ালেন রাহুলজী। ফাটলটা বেশ চওড়া। ভেতরটা দিনের বেলাতেও অন্ধকার। রাহুলজী পকেট থেকে একটা বড় টর্চ বার করলেন। বললেন 'সাবধানে এস।'

ফাটলের ভেতরে মেঝেটা ক্রমশঃ নিচের দিকে নেমে গেছে। একটা বাঁক পেরোবার পর ঘন অন্ধকার চেরা টর্চের আলোয় আমি অবাক চোখে দেখলাম এক বিশাল দরজার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কী করে যে সেই বিশাল দরজা রাহুলজী এক নিমেষে খুলে ফেললেন, বুঝলুম না। দরজা পেরিয়ে বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নেমে এক প্রশস্ত ঘরের মতো জায়গায় এসে দাঁড়ালাম আমরা। অত্যন্ত অভ্যস্থভাবে ঘরের দেয়ালে চারটে মশাল জ্বালিয়ে দিলেন রাহুলজী। আমার মনে হল স্বপ্ন দেখছি।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা কাঠের পুরু পাটাতনের ওপর রয়েছে অদ্ভুত এক বাদ্যযন্ত্র। এমন জিনিস কখনো দেখিনি আমি। ওপর দিকটা মনে হল সোনার তৈরি। বাকিটুকু কী ধরণের ধাতু দিয়ে তৈরি বুঝতে পারলাম না। একটা আড়াআড়ি নল বসানো আছে, তাতে বাঁশির মতো ফুটো। গুণে দেখলুম একুশটা নল সেই আড়াআড়ি নল থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে উঁচু হয়ে রয়েছে। ঠিক যেন

একসার ছোট ছোট কামানের মুখ। এই নলগুলো একটা নক্সা করা বাক্স'র (বাক্স ছাড়া আর কী হতে পারে বুঝলুম না।) ওপর বসান। বাক্সটা প্রায় আমার কোমরের সমান উঁচু। এটা যদি সত্যি কোন বাজনা হয় তাহলে নিশ্চয় তা বাজাতে হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। যে দিকে একুশ নলের মুখ, বাক্সর সে দিকটাতে নক্সার মাঝে মাঝে অনেক ফুটো চোখে পড়ল।

আমি প্রায় হাঁ হয়ে দেখছি (জিনিসটা যাই হোক না কেন, খুবই মূল্যবান সন্দেহ নেই।) সম্বিত ফিরল রাহুলজীর কথায়। সেই বিশাল ঘর গম গম করে উঠল ওঁর গম্ভীর গলায় আওয়াজে।

'এই সেই মরণ-ভেরী যার শব্দে ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল বসুমিত্রের প্রাসাদ আর ওই বিশাল সূর্য্য মন্দির। এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার ?'

আমি বললাম, 'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়। এমন একটা জিনিস আপনি পেলেন কোথায় ? পৃথিবীর যে কোন মিউজিয়ম এ জিনিস পেলে ধন্য হয়ে যেত।'

'ধন্য হয়েই যেত বটে !'—রাহুলজী বললেন, 'অন্য কারোর হাতে এ জিনিস পড়লে সর্বনাশ হয়ে যেত। আর আমি পেলুম কী করে ?'—হা হা করে হাসতে লাগলেন বৃদ্ধ। সেই ফাঁকা বিশাল পাতাল ঘরে, মশালের আলোয়, সেই অনৈসর্গিক পরিবেশে বৃদ্ধ রাহুলজীর হাসি প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসতে লাগল। আমি সম্মোহিতের মতো বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলুম তাঁর দিকে।

'শোন ছোকরা, আমি এই বাঁশি পেয়েছি কারণ ওই সূর্য্যমন্দির আর ওই সূর্য্যভেরীর ওপর একমাত্র অধিকার আমারই। আমি সেই আচার্য্য বংশের সেই জীবিত বংশধর। পুরুষানুক্রমে আমরা রক্ষা করে এসেছি এই সম্পদ। আর তুমি যা অসম্ভব ভাবছ, তা যে কতখানি সম্ভব, সে বোঝবার শক্তি তোমার নেই।'

'যৌবনে বহু পরিশ্রম করে আমি শিখেছি এই বাঁশি বাজাবার কায়দা। তখন আমিও বিশ্বাস করতুম না যে এ বাঁশি সব ধ্বংস করে দিতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান নিয়ে দীর্ঘদিন আমি পড়াশোনা করেছি, নানা বিষয়ে গবেষনা করেছি। তাই আজ আমি বিশ্বাস করি এর ক্ষমতায়।'

'তুমি কী জান, নিম্নকম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গর শক্তি কী ভয়ঙ্কর ? ওই তলার বাক্সে একশো আটটা নল আছে। বাক্সটাই আসলে একটা অত্যুন্নত মারণ-যন্ত্র। ওপরের বাঁশির একটা চাবি ঘোরালে তলার নলগুলোর সঙ্গে ওপরটার যোগ হয়ে। চাবি বন্ধ থাকলে শুধু বাজনাই শোনা যায়। এ বাঁশি বাজাতে তলার একটা প্যাডেলে চাপ দিতে হয়। ওই চাবি খুলে ওপরের রীডে একটা বিশেষ সুর বাজালে নিচের নলগুলোর মধ্য দিয়ে সংনমিত বায়ু বয়ে যায় আর তার ফলে তৈরি হয় সাতাশ থেকে ত্রিশ হার্টস্ কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ। ওই সুরটা আসলে সম্পূর্ণ আঙ্কিকভাবে তৈরি আর সেই শব্দতরঙ্গ সব কিছু চুরমার করে দিতে পারে।

'এই ভয়ঙ্কর শব্দপ্রাস দিয়েই আমার পূর্বপুরুষ বার বার ধ্বংস করেছেন এই সূর্য্যনগরী। শুনলে আরো অবাক হবে, এ মন্দিরে যে সূর্য্যমূর্তি বসান ছিল সে মূর্তি পদার্থ বিদ্যার বিশেষ গূঢ় সূত্র মেনে তৈরি করা। প্রাচীন নথি ঘেঁটে সে প্রমাণও আমি পেয়েছি। দেবতার মহিমা নয়, বিজ্ঞানের সূত্রই ছিল এ মন্দিরের আসল রক্ষা-কবচ। তাই ওই ভেরী বাজলে সবই ধ্বংস হয় যেত, কিন্তু অটুট থাকত ওই মন্দির চত্বর। মূর্খ আকাট বসুমিত্র সেকথা জানত না, জানতেন প্রজ্ঞাশঙ্কর। জেনেও প্রচণ্ড ক্রোধে তিনি বাজিয়েছিলেন ওই মরণ-ভেরী। ধ্বংস হয়েছিল নগর-প্রাসাদ, চুরমার হয়েছিল পবিত্র সূর্য্য মন্দির। সেই ভয়াবহ তাণ্ডবের হাত থেকে রক্ষা পায়নি কেউই। আর শুধুমাত্র তোমার জন্যেই সেই ধ্বংস ঘটবে আবার।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামলেন রাহুলজী। তারপর হিংস্রভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, শুধু তোমার জন্যেই। তোমার রিপোর্ট পেয়ে সরকারী লোকেরা ওই মন্দির চত্বর ভেঙে ফেলবে—অপবিত্র করবে, তার আগেই আমি বাজাব ওই ভেরী। প্রয়োজন হলে ওই শহর, ওই পাহাড় সব নিশ্চিহ্ন করে দেব আমি।' রাহুলজীর হিলহিলে কণ্ঠস্বর চাপা আক্রোশের মতো বেজে উঠল।

আমি প্রতিবাদ করে বললুম, 'সরকারী লোকেরা মন্দির চত্বর ভাঙবে, পাহাড় কাটবে, সে তো ভালর জন্যই। আর আমি তো সরকারী নির্দেশ পালন করেছি মাত্র। তার জন্য কী আমি দায়ী ?'

'না'—চিৎকার করে উঠলেন রাহুলজী। 'এখানে অন্য লোকের হাত পড়লে আমার ক্ষতি হবে। তুমি তো ইচ্ছে করলেই রিপোর্টটা বদলে দিতে পারতে ! বলতে পারতে এখানে রাস্তা তৈরি হওয়া সম্ভব নয়।' [এরপর ৩৯ পৃঃ]

একটুখানি চুপ করে রইলেন রাহুলজী। কী যেন ভেবে নিলেন। তারপর আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন ঘরের এককোণে। এখানে যে একটা দরজা আছে, সে কথা বুঝতেই পারিনি আমি। দরজাটা খুলে ফেললেন রাহুলজী। একটা মশাল নিয়ে আসতেই যা দেখলুম তা আমি জীবনে ভুলব না। উঃ—অবিশ্বাস্য। আলাদীনের দৈত্যও বোধহয় এত ধনরত্ন একসঙ্গে দেখেনি। আমি কথা হারিয়ে ফেলাম। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার উচ্চগ্রামে হেসে উঠলেন রাহুলজী।

'কত পুরুষের সঞ্চিত এ দৌলত আমি জানি না। কিন্তু এ সব আমার। একা আমি ওই বিরাট দৌলতখানার মালিক। হাজার হাজার বছর ধরে সূর্য্যমন্দিরের প্রধান পুরোহিতেরা সঞ্চয় করেছেন ওই সব কিছু।'—মাতালের মতো, পাগলের মতো হাহাকার করে উঠলেন বৃদ্ধ, 'বলতো, আমি কাকে দিয়ে যাব? আমার তো কেউ নেই। কিন্তু রাস্তা তৈরির নামে ওরা যে সব লুটে নেবে।—সে আমি কিছুতেই হতে দেব না!'

কিন্তু অন্য লোকে তো সহজেই আসতে পারে এখানে।'

'এখানে?' অবাক হলেন রাহুলজী, 'আমি ছাড়া ওই দরজা কেউ খুলতে পারে না। তাছাড়া প্রয়োজন হলে ওই ফাটলের মুখ আমি বন্ধ করতে পারি। তা নইলে এত বছর সব বিপর্য্যয় এড়িয়ে এসব রক্ষা পেত না। আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? আন্দাজ করতে পারছ!—ঠিক সূর্য্য মন্দিরের তলায়।'

এতক্ষণ পরে একটু নরম শোনাল রাহুলজীর গলা। আমার হাত দুটো ধরে মিনতি করে বললেন, 'তুমি এই সব দেখেও চুপ ক'রে আছ? আমাকে কথা দাও, এখানে সড়ক তৈরি হবে না। তার জন্যে আমি তোমাকে যে পরিমাণ অর্থ দেব তাতে তোমার কয়েক পুরুষের অভাব ঘুচে যাবে।'

আমি সত্যি বিচলিত বোধ করলুম। বললাম, 'রাহুলজী, তা আর সম্ভব নয়। রিপোর্ট তো আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার কাজও শেষ হয়ে গেছে। আর দুদিন পরে আমি চলে যাব এখান থেকে।'

জ্বল জ্বল করে উঠল রাহুলজীর চোখ। 'তুমি আমার কথা রাখবে না তার মানে। আচ্ছা। সূর্য্যদেবের যা ইচ্ছে, তাই ঘটবে তাহলে।'

আর একটাও কথা না বলে রাহুলজী আমাকে নিয়ে এলেন সেই ফাটলের মুখে! বললেন, 'যাও—আর কখনো ফিরে আসতে চেষ্টা করবে না এখানে।'

বৃদ্ধ আর একবারও চেয়ে দেখলেন না আমার দিকে। নেমে গেলেন সেই পাতালের গহ্বরে! আমি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার চোখের সামনে পাথরের ফাটল বন্ধ হয়ে গেল কোন অজানা মন্ত্রবলে, আমি জানিনা।

আমি কী এতক্ষণ স্বপ্ন দেখলুম? ওই মারণ শব্দপ্রাস কী সত্যিই আমাদের প্রাচীন প্রযুক্তির চাক্ষুস নিদর্শন, নাকি রাহুলজীই তৈরী করেছেন ঐ মারাত্মক অস্ত্র, এই বিশাল রত্নাগার রক্ষা করবার জন্য? রাহুলজী কী বৈজ্ঞানিক না বদ্ধ উন্মাদ?

রাত্রি যখন গভীর :

রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। রাহুলজীকে সারাদিন দেখিনি আর। মনে উদ্বেগ নিয়ে শহরেও ফিরতে পারিনি। সূর্য্য মন্দিরে আসবার পথে, পাইন বনের সামনে যেখানে আমার লোকেরা ক্যাম্প করে আছে; সেখানেই রয়েছি।

কালো রাত্রির চাদরে সবদিক ঢাকা। তাঁবুর বাইরে এসে তাকিয়ে দেখলাম আকাশের দিকে। মনে পড়ল সকালে দেখা সেই আশ্চর্য্য পাতালপুরীর কথা। হঠাৎ যেন সেই সূর্য্য মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আমাকে আকর্ষণ করতে লাগল প্রচণ্ডভাবে।

তাঁবু থেকে পিস্তলটা আর টর্চটা নিয়ে বেরিয়ে এলুম। বাকি সকলে ঘুমুচ্ছে। পায়ে পায়ে এগোলাম বনের পথে। কিন্তু বেশীদূর যেতে পারলাম না। একটা অপ্রাকৃত মৃদু আওয়াজ কানে এল। মৃদু গম্ভীর কখনো-না শোনা এক অদ্ভুত বাজনা যেন বাজছে দূরে কোথায়। আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলুম।

ক্রমে ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল সেই আশ্চর্য্য শব্দ। দ্রুতলয়ে সেই উদাত্ত সুর ভীমনাদের মতো ভাওকীর গায়ে প্রতিধ্বনিত হ'তে হ'তে ফিরে আসতে লাগল। ছড়িয়ে পড়তে লাগল আকাশে বাতাসে। হঠাৎ মনে হল পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। সেই আশ্চর্য্য বাজনার শব্দ

ছাড়াও একটা গুর-গুর আওয়াজ ভেসে এল। চোখের সামনে দুলতে লাগল শাল-পাইন ইউক্যালিপটাস। আর আমার সারা শরীরে ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়তে লাগল অদ্ভুত তীক্ষ্ম যন্ত্রণা। আমি ছুটতে শুরু করলুম। হাতের টর্চটা কোথায় ছিটকে পড়েছে জানি না। ছুটতে ছুটতে কোন দিকে কতদূরে এসেছি জানি না। আমার পথরোধ করে বিশাল একটা গাছ সমূলে উপড়ে পড়ল। এটুকু মনে আছে।

আর কিছুই মনে নেই।

* * *

আমি শহরের হাসপাতালে শুয়ে আছি। সে রাত্রিতে অজ্ঞান হয়ে যাবার পর তিনটে দিন কেটে গেছে। আমি মাথা তুলতে পারছি না। সারা গায়ে ব্যাণ্ডেজ। কী করে আমি এখানে এসে পৌঁছেছি তাও জানি না। এতদিন আমি অজ্ঞান হয়েই ছিলুম। এখনো কথা বলবার শক্তি নেই। নড়বার ক্ষমতা নেই।

ডাক্তার নার্সদের কথা থেকে বুঝতে পারছি গোটা অঞ্চলটাতে এক প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প ঘটে গেছে। ভাওকী পাহাড়ের গায়ে পুরাতন সূর্য্য মন্দির সমেত গোটা অঞ্চলটা তলিয়ে গেছে এক অতলস্পর্শী খাদে। অদ্ভুত অদ্ভুত ফাটল ছড়িয়ে গেছে সারা ভাওকীর গায়ে। এখানে, এতদূরে, ওই শহরেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিপুল। অনেক বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। অনেক জায়গাই সম্পূর্ণ নেমে গেছে পাথুরে জমির ফাটলে। বহুলোক হতাহত হয়েছে। তাদের অনেককেই দেখতে পাচ্ছি আমার আশেপাশে। কয়েক মাইল জুড়ে তাণ্ডব-নৃত্য করে বেড়িয়েছেন যেন রুদ্র ভৈরব। এমন প্রলয়ের মধ্যে আমি কী করে বেঁচে গেলুম জানি না। বিশেষজ্ঞরা নাকি বলছেন এমন বিধ্বংসী ভূমিকম্প এ অঞ্চলে কয়েকশো বছরের মধ্যে ঘটে নি।

আমি ওদের কথা শুনতে পাচ্ছি। ওরা কিছুই জানে না। ওরা জানে না সূর্য্যভেরীর কথা। ওরা জানে না সেই মারণ তূর্য্য বেজে উঠেছিল সেই প্রলয়ের রাতে। ওরা জানে না সেই আশ্চর্য্য রত্নগুহা পবিত্র মন্দির চত্বর আর সেই ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র নিয়ে আচার্য্য রাহুলশঙ্কর ধ্বংস হয়ে গেছেন, তলিয়ে গেছেন পৃথিবীর অন্তঃপুরে। ওরা শুনতে পাচ্ছে না অবশ ঠোঁট নেড়ে আমি কী বলছি। শুনলেও ওরা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমি ঠিক জানি।

সেইদিন, সেই বিভীষিকাময় রাত্রির কথা মনে পড়লেই এক অসহ্য কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ছে আমার ক্ষতবিক্ষত শরীরে। চোখের সামনে নেমে আসছে অন্ধকার।

প্রথম দমকলের ব্যবহার :

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় জার্মানীর আগসবার্গের অগ্নিনির্বাপকরা প্রথম অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নেভাতে। একটা পুরো জলের চৌবাচ্চাকে চাকার ওপর বসিয়ে লিডার চালিত পাইপের সাহায্যে জল ছেটানো হোত। কিন্তু ১৬৫০ সালে ডাচ ইঞ্জিনীয়ার জান ভানডার থাইডেন প্রথম আধুনিক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাতে চামড়ার হোসপাইপও ছিল। ঐ সময় ইঞ্জিন টেনে আনত ঘোড়া বা মানুষেরা। ১৮৩০ সালে এলো প্রথম বাষ্পচালিত ইঞ্জিন, যার সাহায্যে জল পাম্প করা হোত। লন্ডনের মেট্রোপলিটান ফায়ার বিগ্রেড ১৮৬১ সালে প্রথম ব্যবহার করেন ষ্টিম-ফায়ার ইঞ্জিন—এটি টেনে আনত ঘোড়ার দল।

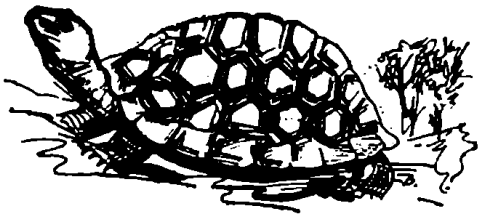

চ্যাথাম দ্বীপের সরীসৃপ

প্রবাল মুখোপাধ্যায়

সরীসৃপ বলতে প্রথমেই সাপের কথাই যেন মনে হয়। কিন্তু এ ছাড়াও আছে বা ছিল নানান জীব, নানান রকমের চেহারার প্রাণী। ডাইনোসর থেকে আরম্ভ করে টিকটিকি কুমীর কচ্ছপ সবাই কিন্তু এই একই শ্রেণীভুক্ত প্রাণী—সবাই সরীসৃপ। ডাইনোসরের নাম কে না শুনেছে! সময়টাকে বলা হত মেসোজোয়িক যুগ, যখন ডাইনোসর, টাইরানোসর এবং তার দোসরদের অত্যাচারে অন্যান্য প্রাণীদের প্রায় লুপ্ত হয়ে যেতে হচ্ছিল। মেসোজোয়িক যুগকে তাই সরীসৃপদের সুবর্ণযুগ বলা হত। অথচ এই সরীসৃপদের মধ্যেই আছে এমন একটা প্রাণী যার চরিত্রটা ওদের অন্য সদস্যদের চেয়ে একদম আলাদা। কচ্ছপের নাম কে না শুনেছে? আর কচ্ছপের কামড়ের কথা শুনলে তো কথাই নেই—ও রকম কামড় তো নাকি খুব কম প্রাণীই দিতে পারে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই কামড় দেওয়ার কোনও দাঁত এদের চোয়ালে থাকেনা, তার বদলে থাকে চোয়ালের ওপর হাড়ের তৈরী দুটো শক্ত পাত।

অনেক পুরোনো দিন থেকেই কচ্ছপকে নিয়ে নানা গল্প শোনা যায়। পুরাণে রয়েছে, এই পৃথিবীটা নাকি কচ্ছপের পিঠের ওপর বসানো। হিতোপদেশের গল্পে আছে, প্রাণের দায়ে পালাতে ওকে সাহায্য নিতে হয়েছিল দুটো হাঁসের যার একটা কাঠির দুদিকে দুজন ধরেছিল আর কচ্ছপ ঠোঁট দিয়ে ধরেছিল কাঠির মাঝখানটা, উড়ে যেতে যেতে নীচে দুষ্টু ছেলেদের হৈ-চৈ শুনে কচ্ছপ কিঃযেন বলতে গেলো—একবারে সোজা নীচে। আবদুল মাঝির গল্পে কচ্ছপের ডিমের কথা কে না জানে। আর ঈশপের গল্পে এই ধীর, অচঞ্চল কিন্তু সংকল্পে অবিচল প্রাণীটির যে অহংকারী খরগোশকে দৌড় প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়ে লজ্জার একশেষ করে দিয়েছিল, সে তো সবারই জানা।

এরা কিন্তু উভচর—জল এবং ডাঙা দুটোতেই এদের স্বাচ্ছন্দ চলাফেরা। আর ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলা-ফেরাতেও এরা খুবই অভ্যস্ত। অসুবিধা কি, নিজেরাতো যেন এক একটা যুদ্ধের চলমান প্যাটন ট্যাঙ্ক। দেহটা একটা বাক্সের আকারের খোলের বর্মের মধ্যে ঢোকানো থাকে। খালি মুখটা বার করে দেখে নেওয়া কোন দিকে যেতে ইচ্ছা করে আর বিপদ দেখলেই ঐ শক্ত খোলের মধ্যে মাথাটা ঢুকিয়ে নিয়ে হাত পা গুলো গুটিয়ে নিয়ে মড়ার মত পড়ে থাকা। এদের শক্ত খোলের ওপর দিকের পিঠটাকে বলে ক্যারাপেস বা শেল আর নীচের আধা শক্ত কিন্তু খুব নরম নয় জিনিসটার নাম পলাসট্রন। এক একজনের ক্যারাপেসটার ওপর কি সুন্দর নকসা করা থাকে।

যে সব কচ্ছপ নদীতে থাকে তাদের বলে টার্টল। এরা আকারে অনেক বড় হয়। আর জলের মধ্যে সাঁতার দিতে এরা ভারী ওস্তাদ। আমাদের দেশের নদীগুলোতে যাদের দেখতে পাওয়া যায় তাদের বৈজ্ঞানিক নাম ডার্মোচেলিস এ্যালিগ্যান্স। এদের লেদার টার্টলও বলে। কচ্ছপদের যারা ধীর গতির বলে ভাবে তারা ডার্মোচেলিসদের জলের মধ্যে গতি দেখলে অবাকের একশেষ হতে হবে। জলের মধ্যে এত গতির কারণ হল এদের হাতে এবং পায়ের আঙুলগুলো পাশাপাশি জোড়া লেগে বেশ চওড়া পাতের আকার নিয়েছে, যেটা নৌকোর দাঁড়ের মত কাজ করে। আর এক শ্রেণীর কচ্ছপ যারা নদীতে থাকার চেয়ে খানাডোবাতেই বা ডাঙায় থাকতে পছন্দ করে—তাদের বলে টর্টইজ। এরা যেহেতু ডাঙাতেই চলাফেরা করে, তাই এদের আঙুলগুলো জোড়া নয়, আলাদা আলাদা, আর তার শেষে নখ থাকে। আমাদের দেশে ট্রাইয়োনিকস্ নামের কচ্ছপই বেশী দেখা যায়। জলে থাকলেও এরা কিন্তু ফুসফুসের সাহায্যেই নিশ্বাস নেয়, সে জন্য যেগুলো জলে থাকে, সেগুলোকে মাঝে মাঝেই জলের ওপরে ভেসে উঠতে হয়। জলকে বাসস্থান হিসেবে বেছে নেওয়াটা যে নিতান্তই শখের সে কথা বলা যায় না। ডাঙার শত্রুর হাত থেকে বাঁচাটাই আসল কারণ তাদের জলে খাবার দাবারও অফুরন্ত—ছোট ছোট

মাছ থেকে আরম্ভ করে ভাসমান উদ্ভিদ এসব তো আছেই। তবে জলের মধ্যেকার পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার ফলে এদের কিন্তু কিছু কিছু আকৃতিগত বা চেহারার অদল-বদলের মধ্যে যেতে হয়েছে। ডার্মোচেলিসদের পিঠের খোলা তুলনামূলকভাবে হাল্কা, কারণ জলের মধ্যে তো সাঁতার দিতে হবে, তাই বেশী ভারী হয়ে লাভ কী। আত্মরক্ষার বর্ম পিঠের শেল এবং পেটের নীচে প্লাসট্রন তো আছেই। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে এরা খোলস ছাড়ে—পুরোনো শেলটা খসে পড়ে—নীচে নতুনের সৃষ্টি হয়ে যায়। এরা সরীসৃপদের মধ্যে চেলোনীয়া গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। এদের উৎপত্তিগত বংশাক্রম সমীক্ষা করে দেখা গেছে আজ থাকে প্রায় ১৬০ লক্ষ বছর আগে, যুগটার নাম ছিল ট্রিয়াসিক, সেই সময় ওদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে—নাম তার ইউনোটোসর। ওর ফসিল বা জীবাণু পরীক্ষা করে দেখা গেছে ওর চোয়ালে কিন্তু দাঁত ছিল আর শেল বা প্লাসট্রনের মত প্রায় ঐরকমই চাকতি ছিল দেহে। বিবর্তন চুপ করে বসে থাকেনা, তাই ট্রিয়াসিকের পরের যুগ জুরাসিকে এলো ইউনোটোসরের একধাপ এগিয়ে যাওয়া সংস্করণ—চেলোনিয়া গোষ্ঠী, মানে এই কচ্ছপকুল। চ্যাথাম দ্বীপে গিয়ে এক সাহেব বিজ্ঞানী প্রথম কচ্ছপ দেখতে পেয়ে রসিকতা করে বলেছিলেন যে সাপই নিষ্কর্মা থেকে থেকে সরীসৃপ হয়ে গেছে। যাই হোক এই নিষ্কর্মা প্রাণীটার মধ্যে কিন্তু রসিকতার অভাব নেই। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে যখন কোন উৎসাহী ব্যক্তি মাছ ধরবার জন্য ছিপ ফেলে উন্মুখ হয়ে বসে আছে ঘন্টার পর ঘন্টা তখন দেখা গেল হঠাৎ টুপ করে ফাৎনাটা ডুবে গেল। সবাই ধরে নিল যে প্রচণ্ড একটা রুই বা কাতলা উঠল এবার। দেখা গেল, একটা কচ্ছপ হাত পা ছড়িয়ে উঠে পড়েছে ছিপের সামনে।

শিকারী এবং অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীদের অত্যাচারে কচ্ছপদের সংখ্যা কমে গেলেও সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা এক দ্বীপ মিলিয়ে আজও প্রায় দু'শর ওপর এদের প্রজাতি রয়েছে। তাই যে সব দ্বীপে অল্পলোকের বাস সেই সব দ্বীপে বা মহাদেশে এদের প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। এরা আয়তনে কয়েক ইঞ্চি থেকে আরম্ভ করে ৬।৭ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। ডার্মোচেলিস কোরিয়েসিয়া নামের যে কচ্ছপটাকে দেখা গেছে সেটাই সম্ভবত এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড়—লম্বায় ২'১ মিটার (৭ ফুট), ওজন ৫০০ কে, জি। ইরিটমোচেলিস ইমব্রিকেটা বা হকসবিল নামের কচ্ছপের পিঠের এত বাহার যে ওটা সোনারূপার কারিগরদের কাছে অতি দামী। ইমব্রিকেটা খোলের নামটাও কিন্তু পিঠের ঢাকনার ওপর যে টালির মত একটার ওপর আরেকটা চাকতি চাপানোর কারুকার্য আছে সেই জন্যই। গাছপাতা ফলমূল যেমন প্রিয় এদের আমিষজাতীয় খাদ্যও এদের পছন্দ! এরা এক একজন বাঁচেও অনেকদিন। কার নামে একজন সরীসৃপ বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোক সেণ্ট হেলেনা দ্বীপের এক অতিকায় কচ্ছপকে ১২০ বছর ধরে বেঁচে থাকতে দেখেছেন বলে লিখে গেছেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে বন্দী ছিলেন, তখন শোনা যায় একটা কচ্ছপ তার শেষ জীবনের সঙ্গী ছিল।

তবে কি, পিঠের ওপর ওদের যে শক্ত ছাউনি থাকে সেটার ওজনই কিন্তু ওদের ধীরগতিতে আরও ধীর করে দেয়। কিন্তু না থেকেও তো উপায় নেই—আত্মরক্ষার জন্য ওটা দরকারই। তাই যে সব দ্বীপে ওদের শত্রু কম, আফ্রিকার কাছাকাছি দ্বীপগুলোতে, মালাগাসি দ্বীপে টেসটুডো টরনিয়োরি নামের যে জাতের কচ্ছপ পাওয়া যায়, তাদের শেলটার চেহারা এমনভাবে বদলে নিয়ে একটা নরম কিন্তু পুরু খোলের আকার নিয়েছে যে, পুরোনো পাহাড় বা গুহার ফাটলে বিপদ দেখলেই নরম শরীরটাকে নিয়ে লুকিয়ে পড়তে পারে। সিনিকসস নামের প্রজাতির পিঠের খোল যেমন শক্ত তেমনি রুক্ষ!

টেসটুডিনিডি পরিবারভুক্ত কচ্ছপগুলোতে পৃথিবীর সব জায়গাতেই ছড়িয়ে আছে একমাত্র অস্ট্রেলিয়া ছাড়া। এরা ডাঙাতেই থাকে। এদের গ্যালাপ্যাগস দ্বীপে পাওয়া যায়, সেগুলোর বিশাল বিশাল চেহারা। টেসটুডো এলিফ্যানটোপাসের পিঠের শেলটা তো ২৫ ফুট আর ওজনও তাল মিলিয়ে ১৪০ কেজি। নামটা শুনলে সেই রকমই মনে হয়—একে তো দাঁতভাঙা উচ্চারণ তার ওপর নামের মধ্যে আবার এলিফ্যাণ্ট কথাটা রয়েছে, বড় না হয়ে যায় কোথায়। আর চেলোনিডি পরিবারভুক্ত চেলোনিয়া নাম যেগুলোর, নদীতে বা সমুদ্রে থাকলে কি হবে, মাছ মাংসে এদের বড় অরুচি, তাই শুধু গাছপাতা খেয়ে থাকে এরা। যারা কচ্ছপের মাংস খেতে ভালবাসে, তাদের কাছে চেলোনিয়া মায়দাস এক অতি উপাদেয় জিনিস। হোটেল রেস্তোঁরাতে যে গ্রীন টার্টল সুপ পাওয়া যায়, সেই গুলোতো এদেরকে রান্না করেই তৈরী।

ডাইনোসর, ব্রনটোসরেরা পৃথিবী থেকে মুছে গেছে কিন্তু সরীসৃপকুলের নিশান যারা আজও ধরে রেখেছে, সেই অজগর, টিকটিকি, গিরগিটি, গোসাপ, এবং কুমীরদের সঙ্গে নিরীহ হলেও ভাবগম্ভীর কিন্তু আত্ম-বিশ্বাস ভরপুর কচ্ছপরাও সমান ভাবে একই মর্যাদার দাবী রাখতে পারে।

[আগের কথাঃ

একটা বন্ধ উন্মাদের তৈরী রোবট বাহিনী ধ্বংস করে ফেলছে মানবজাতিকে। মানবজাতিকে বাঁচাতে টারজনের সাহায্যের প্রত্যাশায় এসেছে ২২৬০ সাল থেকে বোরোভিয়াক। পৃথিবী রক্ষা করতে পারে চারটি চাবি। সেগুলি আছে ইলেকট্রিক তালা ঝোলা ভল্টে। বোরোভিয়াক ইশারা করতেই ভোজবাজির মত আবির্ভূত হয় ধূমায়িত বৃক্ষের পাশে একটা প্রদীপ্ত চৌকোনা দরজা !]

শেষবারের মত খর চাহনি বুলিয়ে নেয় টারজন আগন্তুকের সর্বাঙ্গে। কে জানে, হয়ত মৃত্যুপথের পথিক হতে চলেছে বিচিত্র এই মানুষটার কথা রাখতে গিয়ে।

উঠে দাঁড়ায় কিন্তু সহজভাবে। দীর্ঘ পদক্ষেপে চাতাল পেরিয়ে গিয়ে প্রবেশ করে সময়-ফটকে···

দুই / অতল গহ্বরের গভীরে

সেকেণ্ড কয়েকের জন্যে টারজনের মনে হ'ল শরীরের প্রতিটা অনুপরমানু ছিঁড়ে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত, কুয়াশা-আবিল আলোক-দ্যুতি মুহুর্মুহু ঝলসে উঠতে থাকে চোখের সামনে। তারপরেই সীমাহীন শূণ্যতায় মধ্যে দিয়ে পতনের আতংকঘন অনুভূতিতে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে সর্বাঙ্গ···শেষ নেই···শেষ নেই এই পতনের·····

আচমকা আঁছড়ে পড়ে শক্ত মত কিছুতে। সম্বিৎ ফিরতে লাগে কয়েকটা সেকেন্ড। তারপরেই বোঝে, পেঁছে গেছে গন্তব্যস্থানে। কোথায় এবং কোন্ সময়ে এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছেনা। শুধু দেখল, এবড়োখেবড়ো পাথুড়ে

অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছে অকস্মাৎ। আশপাশে সামান্য ঘাস, পেছনের ঝড়-জলে ক্ষয়ে-যাওয়া একটা গোলাকার বিশাল পাথর। শ্বাস নেয় বুক ভরে। অত্যন্ত টাটকা বাতাসে ঝরঝরে বোধ করে নিজেকে।

ঠিক এই সময়ে মাথার ওপর থেকে ভেসে এল বিকট রণহুংকার—'গ্রঙ খুন করবে।'

সময় পর্যটনের ধকল পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠার আগেই একী উৎপাত! কোন মতে ঘাড় ঘুরিয়ে নিতেই দেখে, বিশাল গোলাকৃতি পাথরটার মাথায় দাঁড়িয়ে একটা বিচিত্র পুরুষ বিরাট একটা পাথর দু-হাতে তুলে ধরেছে তার মাথা টিপ করে!

নুড়ি-পাথর নয়—মানুষের মাথার চাইতেও বড় পাথর। ঐ পাথর টারজনের মাথায় পড়লে করোটি ছাতু হয়ে যাবে চক্ষের নিমিষে।

চক্ষের নিমিষেই পাথর নেমে এল তার মাথা লক্ষ্য করে। টারজনও চোখের পলক ফেলবার আগেই ছিটকে গেল একপাশে। পাশেই সশব্দে আঁছড়ে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল প্রকাণ্ড পাথর—টুকরোগুলো বুলেটের মত এসে যেন বিঁধে গেল কাঁধে।

যন্ত্রণায় জঙ্গল-প্রভুর মাথার আবিলতা কেটে যায় সঙ্গে সঙ্গে। তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে হাত বাড়ায় কোমরের ছুরির দিকে।

কণ্ঠে জাগ্রত হয়ে ষণ্ড-গোরিলাদের রণ-হুংকার—'ক্রীগা।'

কিন্তু হুংকার ছেড়ে আততায়ীকে রুখে দেওয়ার সময় ততক্ষণে পেরিয়ে গেছে। বাঁজখাঁই ডাক ছাড়ার আগেই হাতে প্রস্তর-ছুরিটা বাগিয়ে গ্রঙ নামধারী লোকটা লাফিয়ে পড়েছে গোলাকৃতি পাথরের মাথা থেকে—ধেয়ে আসছে শূন্যপথে!

পাশে পা বাড়িয়েছিল টারজন সংঘাত এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে—কিন্তু সময় পেলনা। মাথার ওপর আঁছড়ে পড়ে আততায়ীর দেহ—দুজনেই গড়িয়ে যায় ভূমিতে—সম্মিলিত পাশব-গর্জনে কেঁপে ওঠে দিকবিদিক···পরক্ষণেই প্রস্তর-ছুরিকা মাথার ওপর তোলে গ্রঙ বনমানুষদের রাজার বুকে বসিয়ে দেওয়ার নির্ভুল লক্ষ্যে—

বিদ্যুৎ-গতিতে হাত বাড়িয়ে হত্যা-পাগল লোকটার কব্জি খামচে টারজন, জাপটাজাপটি করে ধস্তাধস্তি করতে করতে দাঁড়িয়ে যায় কিছুদূরে। লড়ছে বটে গ্রঙ, পশুর মত আঁচড়ে, কামড়ে লড়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড শক্তিতে ঠাসা প্রতিটা মাংসপেশী দিয়ে। চাবুকের মত আছড়ে পড়েছে গদা-সম বিশাল হাত। কিন্তু টারজনও লড়াই বিদ্যার কম পোক্ত নয়···পিঠের ওপর গ্রঙকে তুলে নিয়ে গড়িয়ে যায় টারজন—প্রস্তর-ছুরিকা ধরা হাতটা দমাদম করে ঠুকতে থাকে পাথুরে জমিতে···মুঠো থেকে খসে যায় ছুরি···টান মেরে দূরে ফেলে দেয় টারজন।

পরমুহূর্তেই কনুইয়ের গুঁতো গিয়ে পড়ে গ্রঙের চিবুকে। জঙ্গল-রাজার এ হেন মার খেয়ে চোখে ধুতরো ফুল দেখেছে মহাবনের বহু মহা-আতংক—গ্রঙ সে তুলনায় কিছুই নয়। চোখে সর্ষেফুল দেখতে দেখতে পড়ে থাকে নিস্পন্দ দেহে।

উঠে দাঁড়ায় টারজন।

গ্রঙ লোকটা খর্বকায়, মাথায় পুরো পাঁচফুটও নয়, ঘাড়ে গর্দানে ঠাসা, ষণ্ডাকৃতি, ডুমোডুমো পেশীর নিরেট পাহাড় বললেই চলে। গাঢ় জলপাই রঙের গাত্রবর্ণ, কিন্তু ধুলোময়লার দরুণ গায়ের রঙ ঐ রকম দাঁড়িয়েছে কিনা বোঝা মুস্কিল। চুল লম্বা, কালো, জটপাকানো। মুখাবয়ব অবিকল গোরিলাদের মত। কোটরাপ্রবিষ্ট খুদে চোখের ওপর ঝুলে রয়েছে লোমশ ভারী ভুরুযুগল। নাক থ্যাবড়া। চোয়াল ঠেলে বেরিয়ে এসেছে সামনে। পরনে একটাই কেবল কটিবস্ত্র—শতচ্ছিন্ন পশুচর্ম।

এবার বোঝে টারজন কোথায় এসে পড়েছে—সময় পথের পেছনে—অতীতের গর্ভে।

সম্বিৎ ফিরে আসছে গ্রঙের। উঠে দাঁড়াচ্ছে। লালা গড়াচ্ছে কষ বেয়ে। ধেয়ে আসার মতলব টারজনের দিকে। হাত তুলে ইশারায় তাকে নিবৃত্ত করে বনমানব অধিপতি। খামোকা লড়াই করার কোনো মানে হয় না। অতীতকালের এই অজানা অঞ্চলে দরকার এখন বন্ধুর।

কিন্তু বন্ধু হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না গ্রঙের হাবভাবে—লড়াই থামানোর কোনো প্রচেষ্টাই নেই।

উল্কাবেগে টারজনের দিকে ধেয়ে আসতেই চোয়াল লক্ষ্য করে বজ্রমুষ্টি হানে জঙ্গল রাজ।

গুহা মানবের চোয়ালে অরণ্য মানবের মুষ্ট্যাঘাত!

প্রচণ্ড সংঘাতে মুহূর্তের মধ্যে ঠিকরে যায় গ্রঙ। নিস্পন্দ। অসাড়।

জ্ঞান ফিরে আসে অবশ্য মিনিট কয়েক পরেই। দেখে,

বাদামীরঙের বিশালদেহী মানুষটা হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে পাশে।

নিবিড় আতংক ঘনিয়ে ওঠে গ্রঙের কুৎকুতে দুই চোখে। চক্ষের নিমিষে গড়িয়ে গিয়ে ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠেই দৌড়োয় প্রাণ হাতে নিয়ে—বাধা দেওয়ারও সময় পায়না টারজান।

বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে পাছু ধাওয়া করে জঙ্গল—অধিপতি!

টারজন দৌড়াচ্ছে লম্বা লম্বা পা ফেলে জিরাফের মত বেঁটেখাটো পা নিয়ে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা নেই গ্রঙের। কিন্তু পথঘাটহীন এই পর্বতালয় যে তার নখ-দর্পনে—টারজন কিছু চেনে না। তাই দেখতে দেখতে টারজনকে পেছনে ফেলে বেশ খানিকটা এগিয়ে যায় খর্বকায় পেশীপর্বতের মত মানুষটা।

কিন্তু টারজনের তখন গোঁ চেপে গেছে। পাকড়াও করতেই হবে গ্রঙকে—চোখে চোখ রেখেছে তাই—দূরত্ব বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও। দেখছে কোথায় যায় গ্রঙ।

বেশ কিছু গাছের জটলা যেদিকে, গ্রঙ পাঁই পাঁই করে দৌড়োচ্ছে সেই দিকেই। টারজন দ্রুততর করে গতিবেগ।

আচম্বিতে কানে ভেসে আসে একটা আর্তনাদ···ঘড় ঘড় গোঙানি—যেন, দম বন্ধ হয়ে আসছে। গ্রঙের গলার আওয়াজ। গাছের জটলা লক্ষ্য করে বায়ুবেগে ছুটে যায় টারজন।

আফ্রিকার জঙ্গলে যে মানুষ, সেই টারজন পর্যন্ত হকচকিয়ে গেছিল প্রথমটা। বিশাল একটা সাপ। জীবনে এতবড় সাপ দেখেনি জঙ্গল-অধিপতি। প্রায় এক ফুট মোটা, লম্বায় যে কতখানি তা আন্দাজ করা যাচ্ছে না। বেশীর ভাগই অদৃশ্য ডালপালার মধ্যে—বেরিয়ে আছে মাত্র বিশ ফুট।

উঁচু ডাল থেকে মাথা ঝুলিয়ে ল্যাজ দিয়ে গ্রঙের একটা বাহু পাকিয়ে ধরে আস্তে আস্তে তাকে মাটি থেকে টেনে শূন্যে তুলছে ভুজঙ্গ মহারাজ!

হোক পেল্লায় অজগর—তবুও হিস্তা সাপ তো! টারজন জানে হিস্তাকে ঘায়েল করতে হয় কি করে।

বিশাল সর্পের হাঁ করা মুখটা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে গ্রঙের দিকে—আস্ত গিলে খাবার মতলব!

জ্যা মুক্ত তীরের মত ছিটকে গেল টারজন—মাথার ঠিক

পেছনেই ঘাড়টা পাঁকড়ে ধরল এক হাতে—হ্যাঁচকা টানে মাথা সরিয়ে আনল গ্রঙের দিক থেকে।

ত্বরিৎ বেগে টারজনের বাহুতে পাকসাট দিয়ে তাকেও শূন্যে টেনে তুলল আদিম হিস্তা।

টারজনের খোলা হাত ততক্ষণে খাপ থেকে টেনে বার করেছে শাণিত ছুরি—আমূল বসিয়ে দিয়েছে দানব-সরীসৃপের দেহে। ছুরি চলছে সমানে—সামনে পেছনে—সামনে পেছনে—পেঁচিয়ে মুন্ডটাকে কেটে আলাদা করে দিচ্ছে ধড় থেকে।

সে কী ঝটপটানি দানব-সরীসৃপ মহাশয়ের। ঝাপটানি সত্ত্বেও ছিটকে না গিয়ে টারজন কিন্তু ছুরি চালিয়ে যাচ্ছে নির্মমভাবে। গ্রঙের দেহ থেকে ল্যাজ শিথিল হ'ল প্রথমে। তারপর মুন্ডটা আধখানা কাটা হয়ে যেতেই পুরো সরীসৃপ দেহটা শিথিল হয়ে হড়কে নেমে আসতে লাগল ডাল থেকে। স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে রইল বৃক্ষতলে। ঝটকা মেরে বাহু-মুক্ত করে নেয় টারজন—গ্রঙকেও টেনে বার করে কুন্ডলীর ভেতর থেকে।

গ্রঙ বিমূঢ়। নোংরা মুখে অপরিসীম বিস্ময়—'গ্রঙকে বাঁচালে তুমি। কিন্তু কেন? অন্যদের মত দেখতেও নয় তোমাকে।'

'অন্যরা আবার কে?'

'লম্বা মানুষ। অদ্ভুত জানোয়ারের সাদা চামড়ার জামাকাপড়। আমার জাতভাইরা বলে, ওরা নাকি দেবতা। আমি কিন্তু দু-চক্ষে দেখতে পারি না'—বলেই হোয়াক্-থু করে এক মুখ থুথু মাটিতে ফেলে গ্রঙ।

'কেন?'

'কথা পড়ে। সাপটাকে চলো নিয়ে যাই গুহায়। মাংস নিয়ে গেলেই গ্রঙ তাহলে আবার দলবলের মধ্যে নাম কিনবে।'

নিরুত্তরে মরা সাপটাকে একদিক নিজের কাঁধে তুলে নেয় টারজন—আর একদিক নেয় গ্রঙ। নির্খুতভাবে কাটা ঘাড়খানা দেখে গ্রঙের চোখ যে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, টারজন তা দেখেছে—মুখে তাই মৃদু হাসি। পাথর ছুরি দিয়ে এমন পরিষ্কারভাবে কোনো কিছুই কাটা যায় না। গ্রঙ তাই হতভম্ব।

যেতে যেতেই কথা হচ্ছে দুজনে। গুহ মানবের কথার ধরন কাটা-কাটা। তর্জমা-যন্ত্রের মাধ্যমে বুঝতে অবশ্য অসুবিধে হচ্ছে না টারজনের। এক সময়ে গুহামানব প্রজাতির সর্দার ছিল গ্রঙ—তারপর এল ওংকার। জিনিষটা সবাইকে দিতেই গ্রঙের জাড়িজুরি ফুরিয়েছে।

টারজন শুনছে আর ভাবছে। 'অন্যরা' বলতে নিশ্চয় সময়-পর্যটকদের কথা বলা হচ্ছে! চাবী যারা এনেছিল—তারা। কিন্তু 'জিনিষটা' মানে কী?

শুধোয় টারজন—'কি জিনিষ বলো তো?'

একটা পাথর। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে। চাঁদের মত। জাতভাইরা ভয়ে মরে—কাছে যায় না। ওংকারের ক্ষমতা তো সেই জন্যেই।'

'পাথরটা যদি আর না থাকে?'

'তাহলে ওংকারকে মেরে খুন করে আমার দলের রাজা হব।'

'আমার নাম টারজন। আমি তোমাকে সাহায্য করব—কিন্তু পাথরটা আমাকে দিতে হবে।'

হস্ত চাহনি মেলে ধরে গ্রঙ। পাথর নিজের দখলে চায় নাকি?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশ্য সায় দেয় টারজনের প্রস্তাবে—'ওংকারের হাতে যেন না পড়ে!'

খাড়াই প্রাচীরের মত পর্বত দেখা গেল সামনে। সানুদেশে এক লাইনে অনেকগুলো গুহার মুখ। সামনে মুষ্টিমেয় গুহামানব—দেখতে প্রত্যেককেই গ্রঙের মতই। আঙুল তুলে দেখা একজন—দৌড়ে এসে ঘিরে ধরে সবাই।

হুঁশিয়ার হয় টারজন। গুহামানবরা এখন যদি তাকে বিষদৃষ্টিতে দেখে, তাহলেই মুশকিল।

সানুদেশে পৌছে অতিকায় সাপটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় গ্রঙ আর টারজন। বোবা বিস্ময়ে গুহামানবরা দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। তার পরেই ধাঁ করে দৌড়ে এসে কয়েকটি মেয়ে মরা সাপটাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায় গুহার দিকে।

অনুকম্পা মিশানো চোখে তাকিয়ে থাকে গ্রঙ।

সবচেয়ে বড় গুহা থেকে বেরিয়ে আসে একটি পুরুষ মূর্তি। গ্রঙের মতই ষণ্ডামার্কা পেশীবহুল বপু—ওংকার!

ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে ধূর্ত চোখে টারজনের আপাদ-মস্তক দেখছে ওংকার।

আর, টারজন দেখছে ওংকারকে। দীর্ঘকায়, হিলহিলে বপু। 'অন্য' দেবতাদের মত আকৃতি। পোষাক কিন্তু গুহামানবদের পোশাকের মত। [চলবে]

খুঁজে বার করো

কয়েকটি জীবজন্তুর ছবি এবং পৃথিবীর মানচিত্রে তাদের বাসস্থানগুলি সংখ্যা দিয়ে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। জন্তুদের চেনবার চেষ্টা করো এবং সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত সঠিক বাসস্থান খুঁজে বার করো। যেমন: ২। ক্যাঙ্গারু

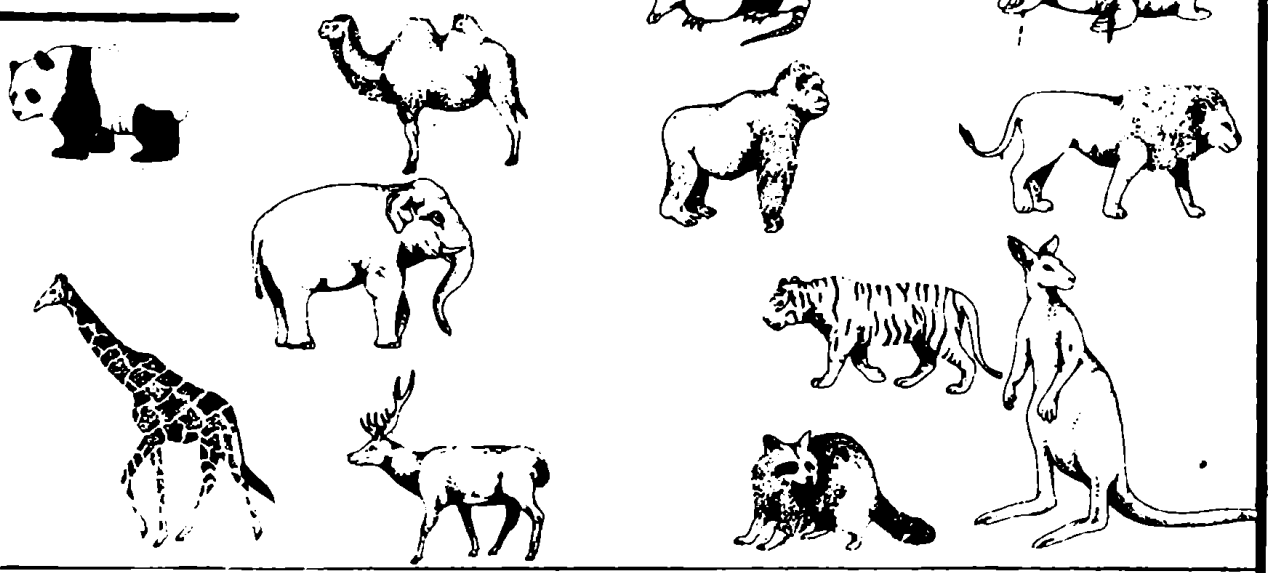

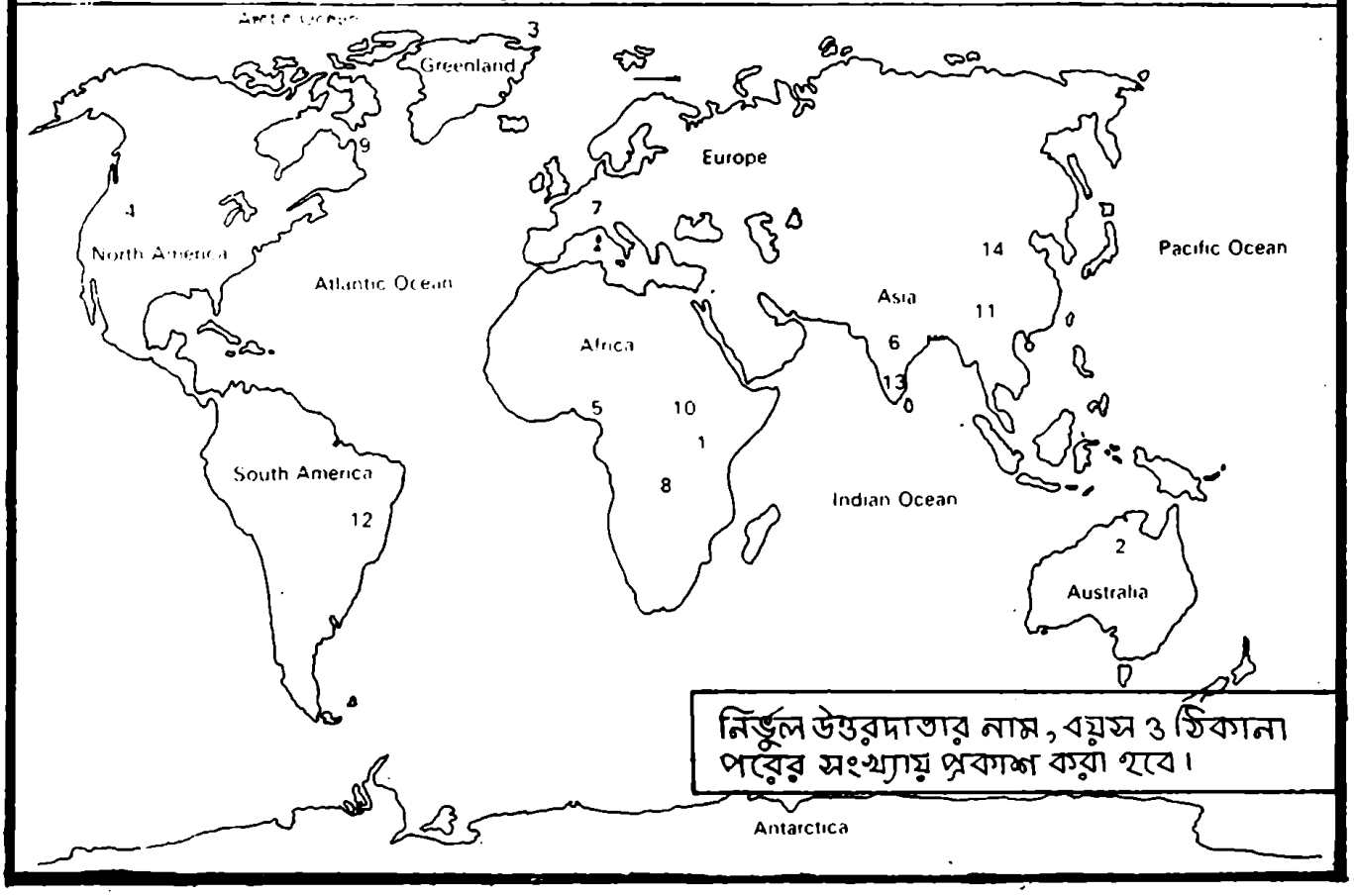

নির্ভুল উত্তরদাতার নাম, বয়স ও ঠিকানা পরের সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

আগুন ধরে গেছে! ন্যাম ট্যাংক ফাটার আগেই পালাতে হবে!
আ- আমার পা আটকে গেছে! কিছুতেই ছাড়াতে পারছিনা...
এই তরোয়ালটাই একমাত্র ভরসা! এ ছাড়া আর কোন পথ নেই..
হ্যাক! হ্যাক!
হ্যাক! হ্যাক!
বার্ট কিরিক ক্ষুরধার তরোয়াল দিয়ে নিজের পা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল... অমানুষিক যন্ত্রনায় ফুঁকড়ে উঠল...
অবশেষে...
সফল হয়েছি! (খুক খুক!) আমি পেরেছি... কিন্তু ব্যথায় হাঁটতে পারছিনা...
সব অন্ধকার...
বুম!
যখন বিমানটা ধ্বংস হয়ে গেল তখন কিরিক অজ্ঞান চোখে দেখল, ঝোপের ফাঁকে তিনটি বাদামি চোখ উঁকি দিচ্ছে।

কয়েক ঘন্টা পর…
ওঃ ভগবান! এ আমি কোথায়…
মে-মান, কোহানি!
আমি একটা গেঁয়ো কুঁড়েঘরে! আমি বেঁচে আছি এবং নিরাপদে!
কোহানি টুটি! কোহানি মেদি!
আমার একটা পা গেছে! বেশ বুঝতে পারছি!
মনে রাখতে হবে আমি পা হারাইনি… তা না হলে আমার মানসিক বৈকল্য দেখা দেবে…
হায়! আমি বুঝি আর বাঁচব না। এ আমি কি করেছি…
কোহানি মেমকস কোহানি!
কোহানি!
ওদের ভাষা বুঝতে পারছি না! ও বোধহয় আমাকে বিশ্রাম নিতে বলছে!
মেয়েটা ঠিকই বলছে। এই মর্মহীন অবস্থায় আমার বিশ্রাম দরকার!

আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

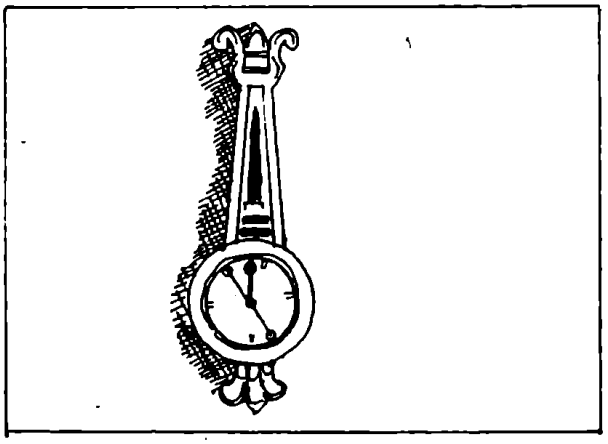

বায়ুচাপ মাপার যন্ত্র ব্যারোমিটার আবিষ্কার করেছিলেন ইতালীয় বিজ্ঞানী ইভাঞ্জেলিস্টা টরিসেলি, ১৬৪৩ সালে।

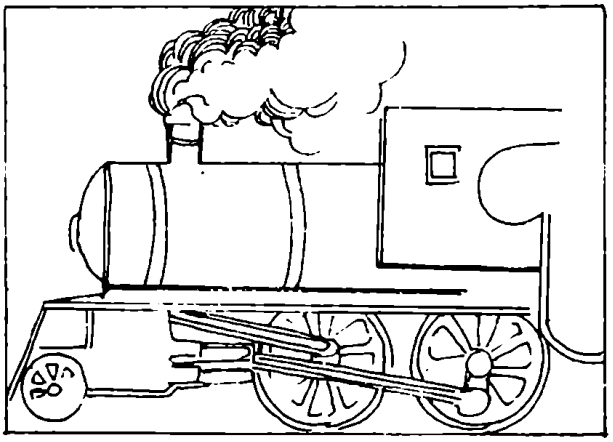

বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিলেন ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী জেমস ওয়াট, ১৭৬৫ সালে।

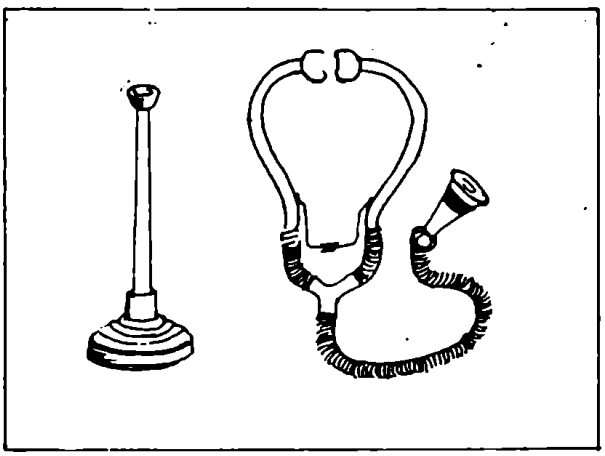

যে যন্ত্রটি বুকে-পিঠে ঠেকিয়ে ডাক্তারবাবুরা আমাদের শরীরের ভেতরের খোঁজ খবর নেন তার নাম স্টেথোস্কোপ। ১৮১৯ সালে ফ্রান্সের রেনে টি. লেনেক স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার করেন।

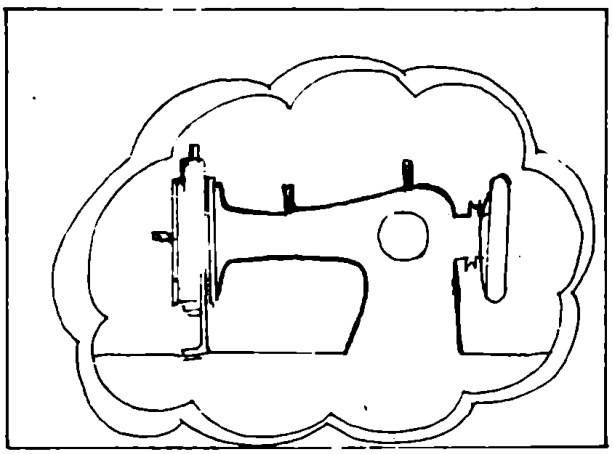

সেলাই কল আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকার ইলিয়াস হো,

কত সালে বলতে পারো?

চোখ

আনন্দ বাগচী

এক একদিন এরকম হয়। ওরা চলে যাবার পরও আড্ডা থামে না। আড্ডা তখন আমার মগজে পুরনো ফাটা 'রেকর্ডের' মত বাজতে থাকে। মেসের এক চিলতে ঘরে দড়ির খাটিয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে বেড সুইচ নিবিয়ে নিষ্পন্দ হয়ে পড়ে থাকি। আমার কানের মধ্যে ভূপতি আর নলিনাক্ষর আবেগমাখা অফুরন্ত কথা আর তর্কবিতর্ক, যুক্তি আর পালটা যুক্তি ধারাবাহিক বাজতে থাকে। বিষয় থেকে বিষয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা এক অসংলগ্ন নাবিকের মত। বা কখনো কোনো একটি ঝলসে ওঠা সংলাপ পিন বসে যাওয়া ফাটা রেকর্ডের মত একটি দুটি শব্দের আখরে মুহুর্মুহু বাজতে থাকে। তারপর এক সময় ঠাকুর এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় খাঁকারি দিয়ে ডাকে, বাবু খেতে আসেন!

ভূপতি ডাক্তার। হাসপাতালের সার্জন। প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করে না বলে তার হাতে সময় আর মাথার খেয়ালের অন্ত নেই। কী একটা দুরূহ বিষয় নিয়ে ও অনেক দিন থেকে নিঃশব্দে গবেষণা করে চলেছে। আর নলিনাক্ষ কোনো কলেজের বটানির প্রফেসার। ওঁর লেখা টেক্সটবুক বাংলা ভাষায় একমাত্র বই যাকে অনেকেই সশ্রদ্ধ ঠাট্টায় বটানির বাইবেল বলে। একটা বইই ওকে বড় লোক করে দিয়েছে। ওদের দুজনের মাঝখানে আমি হাইফেনের মত এখনো বন্ধুত্বে অচ্ছেদ্য হয়ে আছি। কমনফ্রেণ্ড যাকে বলে। আমি নিজেও সত্যিই কমন। বিয়ে থা করিনি, চালচুলো নেই, মেসে থাকি। চাকরিটাও সাদামাটা। খবরের কাগজে। রংফলিয়ে বলা যায় সাংবাদিক, আসলে খবরের কেরাণী। টেলিপ্রিণ্টারের নিউজপ্রিণ্ট বাংলায় তর্জমা করি, সাজাই, হেডিং তৈরি করি, ব্যস এই পর্যন্ত। আর আড্ডায়ও আমার ভূমিকা গৌণ, ওদের তর্কাতর্কিকে উসকে দিয়ে দিয়ে জিইয়ে রাখা, চাঙ্গা করা।

আর ওরা আসে বলেই আমার যে শুধু সময় কাটে তাই না, আমি লাভবানও হই। অনেক নতুন কথা শুনতে পাই, জ্ঞানের কথা, অভিজ্ঞতার কথা, আবিষ্কারের কথা। ওরা দুজনেই বইয়ের পোকা, আর আমি বইকুণ্ঠ, কলেজ-ইউনিভার্সিটি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বইও ছেড়েছি। এখন খবরের কাগজ ছাড়া ছাপা অক্ষরের সত্যি আমার কদাচিৎই সাক্ষাৎ হয়। তাই আমার রস আর রসদ আসে আমার ওই দুটি বন্ধুর কাছ থেকে। নলিনাক্ষর কাছ থেকেই আমি অনেক বিচিত্র আর বিলীয়মান গাছের কথা শুনেছি। অনেক দুষ্প্রাপ্য গাছের বটানিক্যাল নাম পর্যন্ত আমার কণ্ঠস্থ হয়েছে। আজ সবাই জানে গাছের প্রাণ আছে একথা আবিষ্কার করেছিলেন এক বাঙালী ভদ্রলোক। কিছু গাছেরও যে মন আছে; স্মৃতি আছে, রুচি অরুচি আছে,

তারাও যে মানুষের মত কথা বলে, এমন কি মানুষের সঙ্গেও, ভয়ে ক্রোধে ভালোবাসায় উত্তেজিত হয়, হার্টফেল করে মারা যেতে পারে সে কথা নলিনাক্ষ না থাকলে আমি জানতেই পারতাম না।

আজকে ছিল ভূপতির দিন। আলোচনাটা শুরু হয়েছিল রাজনীতি নিয়ে, হাসপাতালের অচল অবস্থা নিয়ে। তারপর জ্যোতিষী, প্ল্যানচেট, জন্মান্তর ইত্যাদি বিষয়ে দুই বন্ধুর মল্লযুদ্ধ হতে হতে অ্যানাটিমি-ফিজিওলজিতে এসে ঠেকল।

প্রথমে বেশ হালকা ভঙ্গিতেই শারীরিক অসঙ্গতি নিয়ে কথা শুরু হয়েছিল। প্রায় সেটা আরম্ভ হয়েছিল নলিনাক্ষর তরফ থেকেই। ও বলছিল, এরকম দেখেছি, এক একজন মানুষের চেহারা আর চরিত্রের সঙ্গে তার কোন বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিল হয়নি। নিখুঁত মূর্তি গড়তে গড়তে ভগবান মাঝে মাঝে কেন এমন করেন জানি না। কারো হাত মনে হয় তার নিজের নয়, শরীরের ছাদের সঙ্গে একদম মানায়নি, কিংবা হাতের সঙ্গে আঙুলগুলো, বেমানান দেখলেই মনে হয় হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—দু ছড়া কলার মত। মাথা যেন মাথা নয়—ঘাড়ে চেপে বসেছে উটকো ভাড়াটের মত। এই ভাবে কারো নাক, কারো কান, কারো পা। একজন ঢিলে-ঢালা অলস স্বভাবের মানুষ, দেখলেই বোঝা যায় আঠারো মাসে বছর কিন্তু হাঁটে যখন মনে হয় টাট্টু ঘোড়া ছুট লাগিয়েছে।

আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ, এই অমিলগুলো হাসির কারণও হয়ে ওঠে কখনো কখনো। হয়তো আড়াইমন ওজনের পিপের মত মোটা লোকটা পেন্সিলের সিসের মত সরু গলায় কথা বলে ওঠে। আবার প্যাকাটি মার্কা নির্জীব চেহারার মানুষের গলায় মেঘ ডেকে ওঠে, চমকে গিয়ে তখন তোমার রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার লাইনটাই মনে পড়বে: অ্যাতোটুকু যন্ত্র হতে এতো শব্দ হয়, সত্যি বিষম বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে!

নলিনাক্ষ হাসল, হ্যাঁ, এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত ব্যাপারের মধ্যেই একটা অদৃশ্য হার্মনি আছে। ছোট ঘড়ি বড় ঘড়ি সব এক মাত্রায় চলেছে। নিক্তি মাপা রাস্তায়। কিন্তু কখনো কখনো কিছু ব্যাপার খাপছাড়ার মত ঘটে। কেমন যেন শ্রিংকোনাইজ করে না। ঘড়ির কাঁটা এক কথা বলছে কিন্তু তার বাজনা অন্য কথা। ঘড়িতে আটটা বেজেছে হয়তো কিন্তু ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেল, দেখোনি কখনো? মানুষের চোখে আর ঠোঁটেও এমনি ঘটনা ঘটবে দেখেছি। ঠোঁটের সঙ্গে চোখ মিলছে না, কিংবা চোখের সঙ্গে ঠোঁট। হয়তো হাসির কথা বলছে। ঠোঁট-মুখ হাসিতে ফেটে পড়ছে কিন্তু চোখ হাসছে না, কেমন বিষণ্ণ কিংবা ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। খুব নিবিষ্ট হয়ে কোন সমস্যার কথা ভাবছে লোকটা কিন্তু তার চোখ দুটো খঞ্জনি পাখির মত নেচেই চলেছে অনবরত। কিংবা হাসছে রহস্যময় হাসি।

ভূপতি লুফে নিল কথাটা, 'ইয়েস নলিন, তুমি একটা জব্বর প্রশ্ন তুলেছ কিন্তু তার আগে বলি, চোখ আমাদের একটা ভাইটাল অর্গান। প্রতিমায় দেখোনি চক্ষু দান করা হয় সকলের শেষে, চক্ষু যোজনা মানেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা। জড় পদার্থ দেখতে পায় না, কেন না তাদের প্রাণ নেই। তোমার সাবজেক্টেই আসি, গাছ দেখতে পায়, তার চোখ আছে, সে যে প্রাণী এইটেই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। চোখ আমাদের অর্ধেক মগজ, বলতে গেলে আমাদের বারো আনা মনই বাঁধা আছে তার মধ্যে। জীবনের একটা প্রধান ধর্মই হচ্ছে গ্রহণ এবং বর্জন। চোখের ভেতর দিয়ে সেই কাজটাই আমরা প্রতিমুহূর্তে করে যাচ্ছি। চোখ তাই কেবল শরীরের সৌন্দর্য বর্ধন করে না, সে আমাদের চেতনা বা প্রাণকে সজাগ রাখে।

আমি হেসে উঠলাম শব্দ করে। আমার হাসি মানেই উসকানি। বললাম, 'তোমার কথাগুলো আমি ঠিক গিলতে পারছি না, বেজায় গুরুপাক হয়ে যাচ্ছে, ভূপতি। তোমরা বিজ্ঞানীরা আমি দেখেছি সহজ ব্যাপারটাকে কেমন জটিল করে তুলে আনন্দ পাও। চোখ জিনিসটা তো শুধু দেখবার জন্যে, যেমন চশমা। তার মধ্যে ফালতু এত সব ব্যাপার ঢুকিয়ে দিচ্ছ কেন?'

ভূপতি রেগে গেল। বলল, 'তোমার মুণ্ডু! সত্যি, মাথায় যদি তোমার শুধু গোবর পোড়া থাকত তাহলেও আশা ছিল। গোবর থেকে গ্যাস হয়, তা থেকে জ্বালানি, আলো, বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যাদের খুলির মধ্যে শুধু রীম রীম নিউজ প্রিণ্ট ঠাসা তারা হোপলেস! চোখ দুটো দিয়ে কি আমরা শুধু দেখিয়ে হতভাগা! চোখ দিয়ে আমরা যেকোনো জিনিসকে ছুঁতে পারি, আস্বাদন করতে পারি। আমাদের শাস্ত্রে আছে ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন হয়। কথাটার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। চোখ দিয়েও আমরা, খেতে পারি, শুনতে পারি,

কথা কইতে পারি। ভিসুয়্যাল মেমরি বলে একটা কথা শোনা আছে নিশ্চয়। আ চোখের সত্যিই স্মরণ ক্ষমতা আছে, স্মৃতি আছে। একবারে তার নিজস্ব, মস্তিস্ক নিরপেক্ষ স্বাধীন ব্যাপার। বুঝলে ব্রাদার, এ-রকমটা নিভুর্ল কমিউনিকেটিভ কম্পিউটার তুমি সারা দেহ তল্লাসী করলেও পাবে না। এই ব্যাপারটা নিয়েই আমি বহুকাল থেকে গবেষণা করে চলেছি। হয়তো একদিন প্রমাণ করে দিতে পারব।'

জানতাম। ভূপতির গবেষণার ব্যাপারটা আমার যে একেবারে অজানা ছিল তা নয়। নিউক্লিয়ার জিনস নিয়ে ও কি সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিল তাও জানি। আমাদের শরীরের সব চেয়ে ছোট ইউনিট সেল বা কোষের যে নিজস্ব এতটা জীবন আছে প্রাণ আছে, আলাদা করে বেঁচে থাকা আছে এরকম একটা কথা ভূপতিই আমাকে একদিন বলেছিল। এই ইনার ইউনিভার্স এই অন্তর্বিশ্ব যার রহস্যের দরজায় ও ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ নিয়ে মাথা খুঁড়ে মরছে। কিন্তু চোখ, যা সহজেই আমাদের চোখে পড়ে, কোনো সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের দরকার হয় না, তা নিয়ে যে এতখানি মাথা ঘামিয়েছে সেইটেই জানতাম না।

আজকেও ওরা চলে যাবার পর আলো নিবিয়ে খাটিয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে আমি একটা ঘোরের মধ্যে পড়েছিলাম। না ঘুমোইনি, নিশ্চয়ই ঘুমোইনি। এই উত্তেজক আলোচনার সঙ্গে নিজের চিন্তা-ভাবনা মিশিয়ে কিছু ভাববার চেষ্টা করছিলাম। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই, আমার চিন্তা সেই পথ ধরেও এগোচ্ছিল না। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না এমন এক রহস্যের জট পাকানো সুতোর তাল দিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম মাত্র। জন্মান্তর, এই জীবনের বাইরের জীবন, মানুষের ইচ্ছাশক্তি, জিনের স্রোত বেয়ে আসা মানুষের সংস্কার, অভ্যেস এবং সব শেষে এই অলৌকিক ক্যামেরা চোখ—যার ভেতর দিয়ে এক জনের মন আর এক জনের মনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছায়, সম্মোহনের এই চাবি কাঠি, এই এক ধরণের রিমোট কনট্রোল নিয়ে কল্পনার জাল বুনে চলেছিলাম এমন সময় আমার নাম ধরে কেউ ডাকল। ডাকল খুব কাছে থেকে, অদ্ভুত গলায়, আমার এক চিলতে ঘরের ঠিক দরজায় এসে।

এক ঝটকায় যেন গোটা মাকড়সার জালটা ছিঁড়ে আমার হাতে মুখে জড়িয়ে গেল, কে! আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। প্যাসেজের জিরো ওয়াটের কমজোরি আলোয় দেখলাম চৌকাঠে হাত রেখে এক সিলুয়েট মূর্তি।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?'

'কই না।'

হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপলাম। বার কয়েক চোখ পিট পিট করে টিউব লাইটটা জ্বলে উঠল। আলোয় চিনলাম। আমাদের মেসের নতুন বোর্ডার। সুশ্রী, ছিপ-ছিপে, নায়ক-নায়ক চেহারা। একবার তাকালে ঝট করে চোখ সরিয়ে নেওয়া যায় না। বয়স গোটা পঁয়ত্রিশের মধ্যে। দিন পাঁচেক হল এখানে এসে উঠেছেন, কিন্তু আলাপ হয়নি। এমনিতেই আমি একটু অমিশুক তার ওপর গোটা সপ্তাহটাই নাইট ডিউটিতে গেছে। নিশাচর প্রাণীর মত দিনে ঘুমোনো আর সন্ধ্যে হলেই কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া। তবু আসতে যেতে দু'-এক ঝলক দেখেছি দূরে থেকে।

একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'আসুন আসুন।'

'স্যরি, ডিসটার্ব করলাম নাকি।'

'না না সে কি!'

'দীপক ব্যানার্জী, পাবনা থেকে এসেছি।' চেয়ারে বসে পড়ে সহাস্যে নমস্কার জানালো।

'আমি ধ্যানেশ সেন, খবরের কাগজে আছি।'

'জানি। মানে শুনেছি। আমি তো আপনার পাশের ঘরেই আছি।'

আমি জানতাম না, কারণ পাশের ঘরে অন্য একজন ছিলেন। তিনি বোধহয় ঘর বদলে নিয়েছেন। এটা সেটা দুচার কথায় আলাপ জমে উঠল। দীপকের বাড়ি পাটনায়। অবস্থা বেশ ভাল। চাকরিটা শখের। এক ওষুধ কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টেটিভ, বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছে।

ইতস্তত করে এক সময় বলল, 'আপনার বন্ধুটি কি চোখের ডাক্তার?'

প্রসঙ্গটা ধরতে না পেরে আমি জিজ্ঞাসু চোখে ওর মুখের দিকে তাকালাম। আর তখনই সত্যি করে চমকালাম। এতক্ষণ মনের যে অস্বস্তির কারণটা ঠিক ধরতে পারছিলাম না এবার স্পষ্ট করে চোখে পড়ল। সেই চোখ। দীপকের চোখ দুটো কেমন সবুজ লুমিনাস পেন্টের মত, থেকে থেকে আলো পড়ে জ্বলে উঠছে। কিছু কিছু পশু চোখ এরকম জ্বলে কিন্তু সেটা তেমন কোন ব্যাপার নয়। আসল ব্যাপার বোধহয় অন্য! ওর চোখের দিকে

ভাল করে তাকিয়ে মনে হল আর দশজনের যেমন হয় তেমন না। এ চোখ যেন ওর সমস্ত অস্তিত্বের বাইরে আলাদা এক ব্যক্তিত্ব। যেন আলাদা একটা মানুষ ওই চোখের ভেতর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শিরদাঁড়ার ভেতরটার কেমন শিরশির করে উঠল। বুদ্ধি কিংবা কথা দিয়ে ও ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। একটা অশরীরী অস্তিত্বের গন্ধ পাচ্ছিলাম যেন।

আমার মুখের চেহারা নিশ্চয় পাল্টে গিয়েছিল। ভয়-পাওয়া লোকের মত হয়তো ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল।

চাপা গলায় দীপক বলল, 'আমার চোখের দিকে কী দেখছেন অমন করে?'

ধরা পড়ে গিয়ে আমি তাড়াতাড়ি কথা ঘোরালাম, 'কই না। ভাবছিলাম আপনি আমার কোন বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করছেন।'

গলা পরিষ্কার করে নিয়ে দীপক বলল, 'ক্ষমা করবেন, এটাকে আড়ি পাতা ভাববেন না। আপনাদের আড্ডার সব কথাই আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম পাশের ঘর থেকে। ভেরী ইন্টারেস্টিং সাবজেকট, অন্তত আমার কাছে। আপনার যে বন্ধুটি চোখের কথা বলছিলেন, উনি নিশ্চয়ই আই স্পেশালিস্ট?'

'ও তাই বলুন। না। চোখের ডাক্তার না। তবে—'

'তবে?'

'চোখের ব্যাপার নিয়ে ওর একটা কেমন ক্ষ্যাপামি আছে। চক্ষু বিষয়ে কি একটা গবেষণা করছে বলল।'

'শুনলাম। তবে আই মাস্ট সে ক্ষ্যাপামি নয়। আমি এ ব্যাপারে, একেবারেই অজ্ঞ, আনাড়ি। তবু বলব, ওঁর অ্যানালিসিস আমাকে চমকে দিয়েছে, চোখ ফুটিয়েছে—,

আমি কথা বলছিলাম কিন্তু আমার চোখ দুটোকে যেন কোন জোরালো চুম্বক টানছিল। চুরি করে এক আধ পলকের জন্য আমি দীপকের চোখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। আর একবার চমকে দিয়ে দীপক শব্দ করে হেসে উঠল। বিস্মিত গলায় বললাম, 'হাসছেন?'

দীপক মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ,। এ হাসি অনেক দুঃখের, ধ্যানেশবাবু।'

'বুঝলাম না।'

'ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, একটা প্রশ্ন করব।'

'কি প্রশ্ন?' অস্বস্তি নিয়ে প্রশ্ন করলাম।

'আপনি আমার চোখ দেখছিলেন! দেখছিলেন না?'

একটি সময় নিয়ে শেষে শুকনো গলায় বললাম, 'হ্যাঁ।'

'দেখে কি মনে হচ্ছে? এ আমার নিজের চোখ নয়, তাই না?'

উত্তর দিতে পারলাম না। বুকের ভেতরটা কেমন কেঁপে গেল। লোকটা কি মনের কথা সব টের পায়! বিব্রত হয়ে চুপ করে থাকলাম।

'ঠিকই ধরেছেন। এ চোখ আমার নিজের নয়।'

আমি হতভম্ব। দীপক আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভাবছি কিছু একটা বলা দরকার। কিন্তু আমাকে কিছুই বলতে হলনা, ও নিজেই আবার কথা বলল।

'বিলীভ মি। এ চোখ আমার সত্যিই নিজের নয়। আর সেটা বুঝতে পারলাম প্রথম কলকাতায় এসে। তা দিন দশেক আগে, তখনো মেসে এসে উঠিনি। এখানে এসে প্রথমে একটা ভাড়া বাড়িতে উঠেছিলাম। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে এই মেসে। একটা বিবর্ণ হাসি দীপকের ঠোঁটে ভেসে উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, 'কিন্তু আমি মূর্খ, নিজের কাছ থেকে কি কেউ পালাতে পারে!'

ভদ্রতাবশত আমি বাধা দিলাম, 'কী বলছেন আপনি। আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।'

'পারবেন। তবে সে এক লং স্টোরি। আপনাকে বোর করছি না তো?'

দীপককে দেখে, তার কথা শুনে আমার কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছিল। এই চোখের পিছনে কি রহস্য লুকোনো আছে কে জানে।

বললাম, 'ঠিক উল্টো। বলুন আপনি। গল্পো শুনতে কার না ভাল লাগে!'

'এটা কিন্তু গল্পো নয়। ফ্যাকট, সত্যি ঘটনা। ব্যাকরণ ভুল হল নিশ্চয়ই, ট্রু ফ্যাকটের মত। তবে আপনার ভাবনার কোন কারণ নেই, যতদূর সংক্ষেপে বলা যায় তাই বলব।'

দীপকের কথাগুলোকে ছাঁটকাট করে সাজালে তার মুখের গল্পটা এই রকম দাঁড়ায়ঃ

সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলে এই পৃথিবী, এই চারপাশ, এই জীবন কেমন লাগে আমার জানা আছে। কারণ এক-টানা পাঁচ বছর আমি কমপ্লিট ব্লাইন্ড হয়ে ঘরে বসেছিলাম। আমার দুনিয়া তখন দুহাতের গণ্ডির মধ্যে, হাতড়ে

বেড়ানো ছোট্ট পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঘড়ি তখন শুধু কানে শোনা একটা বাদ্যযন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। প্রহরে প্রহরে ভাগ করা, দিন আর রাত একাকার হয়ে গিয়ে অনিঃশেষ একটি ভয়ঙ্কর রাত্তির হয়ে গিয়েছিল, যে রাত্রে চাঁদ নেই, তারা নেই, নিরেট নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই। আমার জীবন অর্থহীন আমার আহার বিস্বাদ, আমার প্রিয় বইগুলো বোবা। সম্পূর্ণ একলা মানুষের চেয়েও আমি নিঃসঙ্গ, একা। শব্দ এবং নৈঃশব্দের মাঝখানে বন্দী প্রেতের মত ভেসে রয়েছে। এই যন্ত্রণার তুলনা হয় না।

অথচ দুর্ঘটনা যখন ঘটে এরকমই অকারণে এক পলকে ঘটে যায়। ঘটনার পিছনে যুক্তি থাকে, কিন্তু দুর্ঘটনার কোনো যুক্তি নেই। অর্থাৎ সেটা না ঘটতেই পারত তবু ঘটল। আমার তিরিশ বছরের জীবনে বছর বছর হোলির দিন এসেছে, চলে গেছে। সাবান মেখে সে আবির আর রঙ তুলে ফেলেছে। কিন্তু প্রায় পাঁচ বছর আগের দোলের দিনটি বোধহয় আলকাতার মত কালো রঙ নিয়ে এসেছিল। সেদিন ফাগুয়ার তাণ্ডবের মধ্যে কেউ আমার চোখে রং ছুঁড়েছিল। কি ছিল সেই রঙের মধ্যে জানি না, অনেক কষ্টে যখন চোখ খুললাম তখন দুটো চোখেই আর দৃষ্টি বেবাক অন্ধ হয়ে গেছি। চোখের সামনে যেন কোনো মানুষ নেই, দৃশ্য নেই, কিছু নেই। তবু তখনো একটু আলো ছিল, ঠিক আলো নয়, আলোর আভার মত। ঠিক কি রকম জানেন, গভীর জলের তলায় ডুব দিয়ে চোখ খুললে যেমন দেখা যায় অনেকটা সেই রকম। ডাক্তার বদ্যি এলেন কিন্তু তাঁরা বিদায় নেবার আগেই সে আভাটুকুও আমার দুচোখ ছেড়ে চলে গেল।

পাটনায় আমরা তিন পুরুষের প্রবাসী বাঙালী। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন বিহারের ও অঞ্চলের বিধান রায়। বাবা এখনো ডাকসাইটে অ্যাডভোকেট। দুই পুরুষের জমানো সম্পত্তি আমার একটা জীবনেও ফেলে ছড়িয়ে বোধ হয় শেষ করতে পারব না। কত বড় বড় কনেকশান আমাদের। দিল্লীর দরবার ইস্তক ছড়ানো। তবু শেষ চেষ্টা, ভাই ব্যাঙ্ক থেকে এক জোড়া চোখ পেতে আমাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকতে হল। রক্ত বললেই যেমন রক্ত, ব্লাড-গ্রুপ মিলতে হয়, চোখ বললেই তেমনি চোখ নয়। আমাদের দেহকোষ বা সেলের আধার যে টিসু, তার স্বভাব, তার চরিত্রও বিচিত্র। ফরেনবডিকে সহজে গ্রহণ করতে চায় না। বোধহয় তারও পছন্দ অপছন্দ আছে।

শেষ পর্যন্ত তেমন চোখ পাওয়া গেল। অপারেশনও সাকসেসফুল হল। আমি আবার তাদের মতই দৃষ্টি ফিরে পেলাম। আগে লেখাপড়া করার জন্যে চশমার দরকার হত, এখন হয় না। চোখ ভাল হল, কিন্তু চশমা বেচারি ইনভ্যালিড হয়ে গেল, তার চোখ হারালো। আমি খুশী, আমার যেন পুনর্জন্ম হল। আমি আবার পুরনো কাজে বহাল হলাম।

দিন যাচ্ছিল তর তর করে, ভালই। কিন্তু কোথায় যে ছন্দ কেটে গেছে টের পাইনি তখনও। আসলে আমার স্বভাবের মধ্যে পরিবর্তন আনছিল! চির ধরছিল মনের মধ্যে। সব মানুষের মনের মধ্যেই হ্যাঁ আর না থাকে। অর্থাৎ এক মনের মধ্যে দুই মন। এক মন যাতে সায় দেয়, অন্য মন তাতেই বাগড়া দিতে চায়। তবে এটা খুবই অস্পষ্ট আকারে এবং কখনো কদাচিৎ, তাই তেমন করে বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু আমার কেস আলাদা, দুটোই সমান জোরালো। থেকে থেকে টাগ অফ ওয়ার লেগে যায়। এর ফলে কিনা জানি ন, আমি ক্রমশ কেমন রাগী হয়ে উঠছিলাম।

এই সময় অফিস থেকে আমাকে কলকাতায় পাঠাতে চাইল। আগের দিন হলেই নিশ্চয়ই এই বদলিতে রাজী হতাম না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার জন্যে আমার মনটা কেমন নেচে উঠল। চলে এলাম, বাড়ির অমত সত্ত্বেও। বাসাও ভাড়া নিলাম একটা। কিন্তু কলকাতায় এসে একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিল আমার চোখে থেকে থেকে ডবল ভিসন দেখতে লাগলাম, ডবল ইমেজ বললে স্পষ্ট হবে কথাটা। প্রথম দিনের কথাই বলি। কলকাতায় সেটা আমার দ্বিতীয় দিন। একটা রাস্তা দিয়ে হনহনিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল একটা চেনা দোকান দেখে। থরে থরে কাচের শোকেসের ওপিঠে যে লোকটি বসেছে সে আমার বহুদিনের চেনা। এমন কি তার পেছনের ক্যালেণ্ডারের ছবিটি পর্যন্ত। মনে পড়ল এই দোকানে কতদিন সর-পুরিয়া খেয়েছি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। মাইগড! একি দেখছি। ক্যালেণ্ডারের শালটি ১৯৭৪। ঠিক দশ বছরের পুরনো। এরকম ঝকঝকে দোকানে এক পুরনো ক্যালেন্ডার? চোখ রগড়ে তাকালাম। দৃষ্টি বিভ্রম ছুটে গেল। দেখলাম, না। ১৯৮৪ সালেরই ক্যালেণ্ডার। আর ছবিটা আদৌ আমার চেনা নয়।

চেনা নয় ক্যাশবাক্স আগলে বসা লোকটাও। আর সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার, কাঁচের শোকেসের রসগোল্লা সন্দেশ সরপুরিয়া কোন ভোজবাজীতে রুপোর গয়না হয়ে গেছে। ঝকমকে বাউটি, কানপাশা, টায়রা, কাঁকই। যেন ইলেকট্রিক শখ খেলাম। খেয়াল হল এই রাস্তায় জীবনে এই প্রথম পা রেখেছি। আসলে কলকাতায় এই আমার স্বচক্ষে আসা। এর আগেও একবার অবশ্য এসেছিলাম, মাস কয়েক আগে। সে তো সোজা হাসপাতালে, অন্ধ অবস্থায়। আই গ্র্যাফটিংয়ের পর কালো চশমা পরে সোজা দমদম এয়ারপোর্ট। সুতরাং চেনা লাগবার আদপেই কোনো রাস্তা নেই।

আমাকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, কি চাই আপনার, বলুন দেখাচ্ছি।

আমি ঢোক গিলে বললাম, এখানে কাছে পিঠে একটা মিষ্টির দোকান ছিল না?

ছিল, কিন্তু এখন নেই। লোকটা হাসল, আপনি বোধহয় অনেককাল এ পাড়ায় আসেননি?

কেন বলুন তো?

এইটেই মিষ্টির দোকান ছিল। বছর দুই আগে—

লোকটিকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আমি পালিয়ে এসেছিলাম সেদিন। কিন্তু পর পর আরও গুটি তিনেক ঘটনা ঘটল সেই দিনই। সবই দৃষ্টি বিভ্রমের। কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই। উলটো পালটা, রহস্যময়। সে সব ডিটেলস বলে আপনাকে বোর করব না! তবে কথাটা এই, রীতিমত ভড়কে গেলাম। কেমন মনে হল চোখ খারাপ হয়েছে, তাই এরকম ইলিউশন দেখছি। বোধহয় চশমাই নিতে হবে।

একজন নাম করা আই স্পেশালিস্টের কাছে গেলাম। তিনি নানাভাবে পরীক্ষা করে বললেন, আপনার চোখের স্বাস্থ্য বোধহয় আপনার থেকেও ভাল। আপনি বরং অমুক ডাক্তারের সঙ্গে আজই দেখা করুন। ওঁর চিঠি নিয়ে সেখানে গেলাম। তিনি সাইকিয়াট্রিস্ট। সাদা বাংলায় পাগলের ডাক্তার। আমাকে নানাভাবে বাজিয়ে দেখলেন। তারপর দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, দূর মশাই, আপনার চোদ্দ পুরুষে কেউ পাগল নয়। সাধের পাগল না সেজে সোজা বাড়ি যান। একটা ঘুমের বড়ি দিচ্ছি। সেটি গিলে একখানা উনিশ ঘণ্টার ঘুম লাগান। দেখবেন ফ্রেশ হয়ে গেছেন।

ঘুমের বড়ি আর হালকা মন নিয়ে বাসায় ফিরেছিলাম সেদিন। কিন্তু সব মাটি করে দিল একখানা আয়না। দাড়ি কামানো আয়নায় নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। শির শির করে উঠল শিরদাঁড়ার ভেতরটা। কি দেখলাম জানেন? নিশ্চয় জানেন। একটু আগে আমার চোখে আপনি যা দেখেছেন ঠিক তাই।

তারপর সে রাতে ঘুমের বড়ি খেয়েও কোন লাভ হল না। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মত টুকরো টুকরো তন্দ্রা মাখা ঘুম ভেসে যেতে লাগল চোখের ওপর দিয়ে। প্রতিবারই জেগে উঠে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমার গায়ের সঙ্গে গা মিলিয়ে আর একটা লোক শুয়ে আছে আমার পিছনে। তার গায়ে অসম্ভব তাপ, যেন পুড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় নিঃশব্দে ছটফট করছে লোকটা। থেকে থেকে তার ছোঁয়া লাগছে আমার গায়ে। সে ছোঁয়া কি রকম জানেন। বোবায় ধরলে, কিংবা হঠাৎ ভূতের ভয় পেলে যেরকম গাটা ভারি হয়ে যায় সেই রকম।

পরদিন ধুম জ্বর নিয়ে জ্ঞান ফিরল যখন, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। এক সহকর্মীর বাড়িতে দিন দুয়েক কাটিয়ে তারই চেষ্টায় উঠে এলাম এই মেসে। এখানে অন্তত একা থাকতে হবে না। সিঙ্গল সীটের রুম দিতে চেয়েছিলেন ম্যানেজার, নিইনি। আমার ঘরে আর একজন ভদ্রলোক আছেন।

* * *

দীপক ব্যানার্জীর গল্পটা এইখানেই শেষ হতে পারতো, কিন্তু হল না, ভূপতি আর আমি কি করে ওর গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম। নলিনাক্ষ অবশ্য সব শুনে বলেছিল, 'এটা বিজ্ঞানের যুগ। অলৌকিক গাঁজাখুরি গল্পের পেছনে তোরা যদি দৌড়তে চাস দৌড়ো, আমি ওসবের মধ্যে নেই। লোকটার হয় মাথার গোলমাল, নয়তো মিথ্যে বলছে।'

'মিথ্যে বলে লাভ?'

'এক একজন লোক দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে ওরকম মিথ্যে বলে। তাছাড়া অন্য ধান্ধাও থাকতে পারে।'

'কি ধান্ধা?

'কি করে জানবো!' নলিনাক্ষ পাশ কাটিয়ে গেল। আমার অবশ্য ওরকম মনে হল না। দীপকের সঙ্গে কথা বলে যেটুকু বুঝেছি তাতে ওর মাথার গোলমাল থাকতে পারে কিন্তু মিছে কথা বলছে না। আর অন্য কোনো মতলব নিশ্চয়ই নেই। ভূপতি তো ওর কেসটা লুফেই নিল। তার থিওরির এমন কংক্রিট উদাহরণ একেবারে হাতের গোড়ায়

এসে যাবে, এ যেন ভাবাই যায় না। সব চেয়ে সুবিধের কথা এই, আমাদের তিনজনের মধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে কোন লুকোচাপা নেই। দীপক জানে আমরা তার শুভার্থী, তার এই বিপদের দিনে আমরা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত।

ভূপতির অনুমান এই নতুন চোখজোড়া থেকেই দীপকের এই বিপত্তি শুরু হয়েছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন তবু থেকেই যায়। দৃষ্টি ফিরে পাবার পরেও কয়েকমাস দীপক পাটনায় ছিল। এই নতুন চোখের প্রতিক্রিয়া তাহলে তখন ঘটেনি কেন। সত্যি বলতে কি, কলকাতায় আসার ডবল ভিশন দেখার মত কোন ঘটনাই তার জীবনে ঘটেনি। কেন ঘটেনি? কলকাতায় এসেই বা কেন ঘটলো। এখানে এসে যে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। সেই বাড়ি থেকেই কি তার ওপরে অলৌকিক কোন শক্তি ভর করল? যে শক্তি তাকে অতীতকে দেখার শক্তি যোগায় কোন কোন মুহূর্তে? একই রাস্তায় একই সঙ্গে অতীত এবং বর্তমানকে পাশাপাশি দেখতে পাওয়া অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধ-পুরুষরা অতীত বর্তমানের পাশে ভবিষ্যৎকেও দেখতে পান। ফিল্মের ডবল একসপোজারের মত শোনা যায় ট্রিপল একসপোজার। তিনটে ছবিই পরস্পরের মধ্যে গায়ে গায়ে সাঁটা। তব ওসব পৌরাণিক গাল গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া গেলেও দীপকের ব্যাপারটা কি? ভৌতিক কাহিনী? তাহলে তো প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করতে হয়।

ভূপতি কোন গল্পে সন্তুষ্ট হবার মানুষ নয়। বিজ্ঞানের মাপকাঠিতেই সে সব কিছু মাপতে চায়। তাই তার খুঁটিনাটি প্রশ্নের শেষ নেই। দীপককে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা কথা জিজ্ঞেস করে আর নোট নেয়। কোন হাসপাতালে কবে তার অপারেশন হয়েছিল, কে অপারেশন করেছিলেন। তার পাটনার ঠিকানা, কলকাতায় সেই ভাড়া বাসার ঠিকানা। অসুস্থ অবস্থায় যে সহকর্মীর বাড়িতে ছিল। যে চোখের ডাক্তার, যে সাইকিয়াট্রিস্ট তাকে দেখেছিলেন তাদের সকলের নামধাম বিবরণ যে ভাবে সে নোট করে নিল তাতে বুঝলাম ভূপতির সামনে এখন হাতে কলমে অনেক কাজ। মুখে কিছু না বলুক, তার অনুসন্ধানী অভিযান শুরু হয়ে গেছে। দীপকের গল্প আমি অবিশ্বাস করছিনা, কিন্তু সত্যি বলতে কি তার সঙ্গে আলাপ হবার পরে পুরো একটা সপ্তাহ কেটে গেছে অথচ ও রকম ঘটনা আর একদিনও ঘটেনি। ভূপতির কথা মত দীপক দিন দশেকের ছুটি নিয়েছে, কাজে বেরোচ্ছে না। এই কদিন আমি আর ভূপতি পালা করে ওর সঙ্গে সেঁটে রয়েছি। এক সঙ্গে খাই, ঘুমোই, বেড়িয়ে বেড়াই। বসে বসে গল্প করি। কিন্তু কোন বিস্ময়কর ঘটনা পলকের জন্যেও ঘটেনি। নলিনাক্ষ প্রায় প্রতিদিনই আসে, দীপকের অলক্ষ্যে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হেসে চলে যায়। আমরা কিছুই বলি না, বলার কিই বা আছে। হাতে নাতে প্রমাণ দেখাতে না পারলে অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করানো যায় না। উলটে বিশ্বাসী মানুষের মনও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসে। আমার মনের অবস্থা এখন খানিকটা সেই রকমই। দীপকের চোখ জোড়া দীপকের মুখের সঙ্গে মেলেনি, তার স্বভাবের সঙ্গে বেমানান হয়ে আছে—সেটা টের পাই। সেটা হতেই পারে, কারণ ওই চোখ ওর নিজের নয়, আর একজনের, বাইরে থেকে চেষ্টা করে জোড়া লাগানো। তাই এ রকম মনে হতেই পারে। রাতের বেলায় এক আধ মুহূর্তের জন্যে ওর চোখের মধ্যে সবুজ আলোর ঝিলিক ভূপতিও দেখেছে। ওর চোখের ক্লোজ আপ ছবিও ভূপতি তুলেছে কয়েকখানা।

কিন্তু এতে কি প্রমাণ হয়? কিছুই না। অবিশ্যি সুস্থ মনে হলেও দীপক একেক সময় কেমন উল্টো পাল্টা ব্যবহার করে। দারুণ হাসাহাসি গল্প গুজব চলছে হঠাৎ দীপক গম্ভীর হয়ে গেল, মিনিট দশেক গুম হয়ে বসে থাকল, একটি কথা বলল না। কিংবা দিব্যি বেড়াচ্ছি, আচমকা কি হল, কোন কথা না বলে ও হঠাৎ পিছন ফিরে হনহনিয়ে হাঁটা দিল। পরে এ নিয়ে কথা হলে ও অবাক হয়, ও বিশ্বাস করতেই চায় না ও রকম কিছু করেছে বলে। নলিনাক্ষ শুনে বলে, এ সবই শো বিজনেস বুঝলে।

আজকেও দুজনে বেড়াচ্ছিলাম। রোজ দুচার মাইল আমরা এভাবে হাঁটি। ভূপতি আজ দিন তিনেক কলকাতায় নেই। বোধহয় পাটনায় গেছে। আজকাল ও যে কি করে, কিভাবে, কিছুই ভেঙে বলে না। আমার ওপর শুধু একটা নির্দেশ রেখে গেছে, দীপককে যেন সব সময় চোখে চোখে রাখি। রাখছিও। আজকেও গল্প করতে করতে ফিরছিলাম। হঠাৎ একটা কাণ্ড হল।

ফুটপাথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা অ্যামবাসাডার সবে চলতে শুরু করেছে এমন সময় দীপক গাড়ির মধ্যে কাউকে দেখতে পেয়েই পাগলের মত চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল। আমি ভাল করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই

দেখলাম চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে ফেলে বিদ্যুৎগতিতে সে গাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। গাড়িটাও থামল না, টপ স্পীডে বেরিয়ে গেল। আমি বোকার মত দীপকের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে কিছুদূর পর্যন্ত দৌড়ালাম। শেষে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম রাস্তার মাঝখানে। ধারে কাছে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলেও গাড়িটার পিছু ধাওয়া করতে পারতাম হয়তো, কিন্তু দরকারের সময়ে এই শহরে হাতের কাছে কিছুই পাওয়া যায় না। বহুক্ষণ দীপকের জন্যে অপেক্ষা করে শেষে মেসে ফিরে এলাম। কিন্তু সারারাত অপেক্ষা করেও যখন দীপক ফিরল না আমার দুশ্চিন্তা হতে লাগল। মনে হল কাল রাতেই আমার থানায় ডায়েরী করা উচিত ছিল।

থানায় যাবার জন্যে জামা কাপড় পরছি এমন সময় সেই ভোর সকালে ভূপতি এসে হাজির, মুখে চোখে ক্লান্তি। চুল উস্কোখুস্কো কিন্তু ঠোঁটে একটা সাফল্যের হাসি। এ সময় ও কখনো আসে না। তাই ভীষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিরে কী ব্যাপার? কোথায় ডুব মেরেছিলি এই কদিন।'

ভূপতি উত্তেজিত গলায় বলল, 'সে অনেক কথা, পরে বলব। তবে আসল রহস্যের বোধহয় যবনিকা তুলতে পেরেছি। প্রথম থেকেই আমি এরকমটাই সন্দেহ করেছিলাম।'

আমি নিজের কথা, দীপকের কথা সেই মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়ে সংক্ষেপে ভূপতির অনুসন্ধানের যে কাহিনী শুনলাম সে সত্যি রোমাঞ্চকর। বছর খানেক আগের আমাদের কাগজের হেডলাইনগুলো আমার চোখে যেন ভেসে উঠল। কারণ সেগুলো আমিই লিখেছিলাম।

অনেকগুলো ডাকাতির মামলার ফেরারী আসামী ভাস্কর নস্কর ওরফে ফাস্টাবাবুর হত্যার ব্যাপার নিয়ে তখন কলকাতায় ক'দিন খুব হৈ চৈ হয়েছিল। এই লোকটির শরীরে দুটি রিভলভারের বুলেট পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সে জন্য নয়। এক দল লোকের ধারনা হয়েছিল বেওয়ারিশ এই লোকটিকে দিয়ে আসামী সাজিয়ে পুলিস অন্য কোন বড় ব্যাপার ধামাচাপা দিতে চাইছে। পুলিস অবশ্য ফাস্টাবাবুর খুনীকে ধরতে পারেনি, শুধু খুনীর ফেলে যাওয়া রিভলভার আর কয়েক ফোঁটা রক্ত আবিষ্কার করেছিল। খুনীর ব্লাড গ্রুপ আর আঙুলের ছাপ ছাড়া তাদের রেকর্ডে আর কিছু নথিপত্র হয়নি। এদিকে মুমূর্ষু লোকটি যে দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছিল তা অভাবনীয়, মৃত্যুকালে সে তার দুটি চোখই আই ব্যাঙ্ককে দান করে গিয়েছিল। তার এই শেষ ইচ্ছার কারণ হিসেবে বলেছিল, সে এখনি মরতে চায় না। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চায়। প্রায় কবির মতই কথা। 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে। মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' যাইহোক, ভাস্করবাবু ওরফে ফাস্টাবাবু সত্যিই ডাকাত ছিল কিনা তা জানা না গেলেও সে যে অমানুষিক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ছিল সে বিষয়ে ডাক্তাররা দ্বিমত হননি। ছ' ছ'টি বুলেট হজম করে, ফুস-ফুসে—হৃৎপিন্ডে সরাসরি জখম হয়েও কোন মানুষ যে ঘন্টা-খানেক মৃত্যুর সঙ্গে সজ্ঞানে যুঝতে পারে এবং আর চোখ দুটো তুলে নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে পারে, তাদের কেতাবী বিদ্যায়-এর ব্যাখ্যা নেই।

কিন্তু আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় খবর ফাস্টাবাবুর এই চোট দুটিই শেষ পর্যন্ত দীপকের কপালে জুটেছিল।

ভূপতির মুখে দীপকের নাম শোনা মাত্র আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। ভূপতিকে ওর নিরুদ্দেশের খবর বললাম।

ভূপতি চমকে ওঠে বলল, 'সে কি! থানায় ডায়েরী করেছিলি? অ্যাঁ তাও করিসনি, যাঃ ইডিয়েট! গাড়িটার রং আর নম্বরও নিশ্চয় এতক্ষণে ভুলে মেরে দিয়েছিস? না!'

কালো রং আর আমার একটি প্রিয় সংখ্যা পরপর চারবার ব্যবহার হওয়ায় নাম্বার প্লেট মনের মধ্যে জ্বল জ্বল করছিল। ছুটলাম লোকাল থানায়, সেখান থেকে লাল-বাজারে, তারপর দক্ষিণ কলকাতার এক হাসপাতালেই কাল রাতে যে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির আহত ও সংজ্ঞাহীন দেহ পুলিস রাস্তা থেকে হাসপাতালে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিল তাকে দীপক ব্যানার্জী বলে সনাক্ত করে আমরা ফের ছুটলাম ভূপতির এক্স-পেশেন্ট এবং প্রায় বন্ধুস্থানীয় ব্যারিস্টার ডি, আর মিত্রর কাছে। আইন আদালতের খবরে যাঁদের বিন্দুমাত্র কৌতূহলও আছে তাঁরাই মিত্র সাহেবকে নামে এবং কাহিনীতে চিনবেন। অপরাধীদের কাছে এই ক্ষুরবুদ্ধি আইনজীবী মানুষটি ডিয়ার তো নন-ই, মিত্রও নন। লোকে রসিকতা করে বলে, ইংরেজী ডেনজার শব্দের আদি এবং অন্তের অক্ষর দুটি নিয়ে ধ্রুব রঞ্জনের ডি, আর।

রূপকথার গল্পের মতই দীপকের গল্পও এইখানে শেষ। সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সে মেসে ফিরে এসেছিল। তবে রাজসাক্ষী হয়ে তাকে যথাসময়ে কোর্টে হাজির হতে হয়েছিল। কারণ আমার দেওয়া গাড়ির নম্বর, আর তার দেওয়া মোটর আরোহীর বিবরণের সঙ্গে পুলিস বছর খানেক আগে তুলে রাখা আঙুলের ছাপ আর রক্ত মিলিয়ে ফাস্টাবাবুর হত্যাকারীকে হাত কড়া পরিয়েছিল! সে অনেক ঘটনা এখন। তবে দীপকের চোখ আর তাকে কোনদিন ট্রাবল দেয়নি। কিন্তু ভূপতির থিওরি এইখানে এসেই আচমকা একটা ধাক্কা খেয়েছে। □

বিজ্ঞানের ভেলকি

ডিম ও জাড্য ঃ

এ খেলাকে ম্যাজিক না বলে ভেল্‌কি বলাই ভালো। তোমার সামনে প্লেটে এক ডজন ডিম রেখে ধরো বলা হলো, "এর মধ্যে একটা ডিম সিদ্ধ, বাকীগুলো কাঁচা। তুমি কি ডিমের খোলস না ফাটিয়ে বা না ছাড়িয়ে বলতে পারবে কোনটা সিদ্ধ ডিম ?"

বোকা বনে যাবার আগে একবার পদার্থ বিজ্ঞানের জাড্যের সূত্রটা স্মরণ করে নাও, তাহলে ঠকবে না। প্লেট থেকে ডিমগুলো সরিয়ে নাও। তারপর একটা করে ডিম নিয়ে প্লেটের ওপরে রেখে আঙুল দিয়ে ঘুরিয়ে দাও। দেখবে একমাত্র সিদ্ধ ডিমটা চটপট ঠিক মতো ঘুরতে শুরু করবে। কাঁচা ডিমে, তরল পদার্থের স্থিতি জাড্য'র ফলে পিছুটান বল উৎপন্ন হবে, তার জন্য ডিম ঠিক ভাবে ঘুরতে পারবে না।

Kishore Vismoi June'84 Rs. 2·50 De No.37/84

ছোটদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি আশ্চর্য পত্রিকা

কিশোর বিস্ময়

দু মলাটের ভেতর এক আশ্চর্য জগৎ

আগামী সংখ্যায়

মাকড়সার পাতলা শরীরে যদি আলপিন ফুটিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে এত রক্তপাত হবে যে তাতে মাকড়সার মৃত্যু ঘটে যাবে। এর কারন মাকড়সার চরম হাই ব্লাড প্রেসার। এই রকমই সব জ্ঞান বিজ্ঞানের খবর, কমিকস, বাঁধা, কল্প বিজ্ঞান, আবিষ্কারের কাহিনী এবং সাপ নিয়ে বিশেষ ক্রোড়পত্র

গল্প

শেখর বসু : সিদ্ধার্থ ঘোষ : শংকর ঘটক

জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা

অরুণ রতন ভট্টাচার্য ও রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারি

উপন্যাস : অদ্রীশ বর্ধন